পথের পাঁচালী' গ্রন্থের খসড়ার পটভূমি

তীরবিদ্ধ করার পর ভূমিশয্যায় শায়িত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে জরা নামক ব্যাধ বিস্মিত হয়ে ভেবেছিল—দেহী যেন দেহকে ছাড়িয়েও অনেকখানি বিস্তৃত। বিভূতি-সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে একই বিস্ময় জন্ম নেয়। সাহিত্যিক এবং মানুষ—উভয় বিচারেই বিভূতিভূষণ সাধারণ মাপের মানুষের চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন, সাহিত্যপ্রতিভা এবং লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের মহিমা তাঁর নশ্বর দেহকে অতিক্রমকরে চারদিকে এক শুভ্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। বিভূতিভূষণের সাহিত্য বিচারের জন্য তাই আমাদের প্রয়োজন হয় চিরায়ত মাপকাঠির, সমসাময়িক বিচারের সংকীর্ণ পরিধিতে তাঁর মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রকট না হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। দেশকালের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা পরিচিত জগতের সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে শাশ্বত সৌন্দর্যের এবং অনুভূতির চিরায়মান নিকেতন বিরাজিত—যুগে যুগে ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব যার স্বপ্ন দেখে এসেছে—বিভূতিভূষণ তাঁর সহজাত মনন ও ধ্যানের মাধ্যমে বিশ্বসৌন্দর্যের সেই পরম কেন্দ্রকে স্পর্শ করেছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তাঁর রচিত সাহিত্যের মূল্যও সমসাময়িকতার চৌকাঠ পেরিয়ে কালান্তরে স্থিত জনমানসে নিজের স্থান করে নেবার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত।

এই নিবন্ধের লক্ষ্য পূর্বনির্দিষ্ট। সাধারণভাবে বিভূতিভূষণের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত হয়ে কেবলমাত্র 'পথের পাঁচালী' রচনার পটভূমি প্রসঙ্গে নতুন আলোকপাত এর উদ্দেশ্য। সম্প্রতি 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' রচনাকালীন বিভূতিভূষণ লিখিত কিছু খসড়া পাওয়া গিয়েছে, যার থেকে একটি মহৎ উপন্যাস রচনার সময়ে লেখকের মনের নিভৃত চিন্তা এবং ভাঙাগড়া সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র তথ্য মেলে। এসব তথ্য যে কেবল গবেষক এবং ছাত্রদেরই কাজে আসবে এমন নয়, কৌতূহলী সাধারণ পাঠকের কাছেও এগুলি আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠবে বলে মনে করা যেতে পারে।

'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তম উপন্যাস। এ কথা সত্য যে, 'পথের পাঁচালী'-র বিপুল খ্যাতি তাঁর অন্যান্য অনেক মহৎ রচনার গৌরবকে কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ করেছে। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে পাঠক এবং সমালোচকদের কারো কারো মনে একজন উদাসীন, আত্মভোলা, স্বভাবকবির চিত্র ভেসে ওঠে—সবসময় এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ে যিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না এবং একধরনের সহজাত প্রকৃতিমুগ্ধতাকে অবলম্বন করে যিনি কিছু সরল ও সনিষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু এই মহৎ জীবনশিল্পী সম্বন্ধে এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হতে পারে না। Concealment is art—আশ্চর্য শিল্পসুষমার প্রলেপ দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিটি রচনার পেছনে লুকিয়ে থাকা পরিশ্রমের সমস্ত চিহ্নকে মুছে দিয়েছেন। War and Peace-এ কি বহুবার পুনর্লিখিত হবার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় ?প্রতিটি ধ্রুপদী সাহিত্যের পাতায় পাতায় কি লেখা থাকে স্রষ্টার বিনিদ্র রজনীর ইতিহাস ?তাই কখনো সে ইতিহাস প্রকাশিত হলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। 'পথের পাঁচালী'র প্রচলিত সংস্করণে যতখানি পাঠ্যাংশ রয়েছে প্রায় ততখানি বিভূতিভূষণ খসড়া করেছেনএই উপন্যাস রচনার সময়ে। নানা পরিকল্পনা করেছেন তার মধ্যে কিছু ব্যবহার করেছেন, কিছু বাদ গিয়েছে। বাতিল অংশগুলি স্বাভাবিক কারণেই আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে। 'পথের পাঁচালী'-র চেহারা কেমন হতে পারত এগুলি থেকে তার একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। বিস্ময়ের কথা, সবক্ষেত্রেই কিন্তু বাতিল অংশের চেয়ে গৃহীত পাঠ্যাংশ বেশি শিল্পসম্মত এবং যথাযথ—an improvement upon the discarded text. এর থেকেও বিভূতিভূষণের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

খসড়ার পত্রসংখ্যা অনেক। তার সবগুলি এখানে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র'পথের পাঁচালী' রচনার সঙ্গে সম্পর্কিত খসড়ার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে লেখকের মনোজগতের চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করব। পূর্বেও এই সংস্করণের একাধিক খণ্ডে কিছু খসড়া ও টিকা মুদ্রিত হয়েছে, পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও যতদূর সম্ভব সংযোজিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

পরবর্তী অংশ প্রায় সবটুকুই বিভূতিভূষণের রচনা—মাঝে মাঝে মদীয় টীকা বাদ দিয়ে। এই অংশকে তিনভাগে বিন্যস্ত করা সুবিধাজনক।

১. নির্ভেজাল খসড়া অংশ বা Notes. এই অংশের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। যেসব হঠাৎ-মনে-আসা টুকরো ঘটনা উপন্যাসে ব্যবহার করতে চেয়েছেন সেগুলি সংক্ষিপ্তভাবে লিখে রেখেছেন। ফলে এগুলি অনেকক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক বা cryptic.

২. পাণ্ডুলিপি অংশ। এই অংশের চেহারা অনেকটা উপন্যাসের মতো। তবে বহুক্ষেত্রে এর পাঠ প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে মেলে না।

৩. দুর্গাহীন 'পথের পাঁচালী'-র প্রথম কয়েক পাতা। বেশ কিছুদূর লেখার পর একটি বালিকাকে দেখে বিভূতিভূষণের মনে দুর্গার চরিত্র আবছা আদল নিয়ে ভেসে ওঠে। পূর্বের অংশ বাতিল করে তিনি নতুন করে লিখতে শুরু করেন। সেই অজানা 'পথের পাঁচালী'-র প্রারম্ভিক অংশ।

উপরোক্ত ক্রম অনুসারেই এবার আমরা এগুতে পারি। শুধু একটি কথা মনে রাখতে হবে : এই নিবন্ধ কোনোভাবেই 'পথের পাঁচালী' বা বিভূতিভূষণের সাহিত্যকৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন নয়। সাহিত্যিকের মনের ভেতরে যে অদৃশ্য কর্মশালা বা writer's workshop থাকে, যেখানে প্লট, চরিত্র, আঙ্গিক, প্রয়োগকর্ম ইত্যাদি নিয়ে নিয়ত কাজ চলে, সেখানে সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে না। এই খসড়া বিভূতিভূষণের সেই গূঢ় অন্তর্জগতে পাঠককে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত করবে—এই এর সার্থকতা।

পাণ্ডুলিপি প্রাচীন এবং জীর্ণ হওয়ায় ও হস্তাক্ষর সর্বত্র সঠিকভাবে পাঠ না করতে পারায় কোনো কোনো স্থানে পাঠ্যাংশে সামান্য ফাঁক থেকে গেল, কল্পনাশীল পাঠক নিজের মতো করে ভরাট করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য শব্দ বা বাক্য এসব ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাচিহ্নসহ বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা গেল।

[খসড়া পাণ্ডুলিপি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী স্বর্গত রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

।। ১ ।।

বিচ্ছিন্ন খসড়া অংশ

খসড়ার একটি বিশেষ পাতাকে 'পথের পাঁচালী'-র আদি উৎস বলা যেতে পারে। ভাগলপুরের প্রবাসে চাকরি নিয়ে থাকার সময়ে ঠিক কোন্‌দিন বিভূতিভূষণের মনে এই উপন্যাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা আর নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু এই বিশেষ পাতাটিতে তিনি প্রথম তাঁর চিন্তাকে লিখিত রূপ দেন। পরিকল্পনা শুরু হয়েছে এইভাবে:

Dramatis Personae[১]

Plans of Execution

বইখানিতে কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের চিত্র আঁকতে হবে। কি কি ছবি নীচে[২] আভাস দেওয়া হইতেছে[৩] । জগতের সব রকম ধরনের চরিত্র আঁকা বইখানির একটি বিশেষত্ব হবে। যেমন—[(ক) অন্নদা রায় : একজন সুদখোর পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকের ছবি—কুটিল, স্থূলদর্শী, মামলাবাজ, অর্থলোভী, Vision যার বড় কম—প্রতিবেশীকে ফাঁকি দেওয়া ও অনিষ্ট চিন্তাই তার একমাত্র কাজ। relieving feature—পুত্রের প্রতি স্নেহ—]

(খ) নীরেন্দ্রনাথ : একজন আধুনিক যুগের নব্যধরনের উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানপিপাসু নির্মলমনের তরুণ যুবক—নুতন ভাব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত—পড়াশুনা, উচ্চচিন্তাই জীবনের ব্রত।

---

[১]যদিও এই পাতায় কোনো তারিখ দেওয়া নেই, তবু মনে হয় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোনোসময়ে এটি লেখা। কারণ খসড়ায় অন্যত্র যেসব তারিখ রয়েছে, তা ১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যবর্তী।

[২]খসড়া থেকে উদ্ধৃত অংশে বিভূতিভূষণ অনুসৃত বানানপদ্ধতি অবিকল তুলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে সংশোধিত বানান ব্যবহার করা হয়নি।

[৩]দ্রুতলিখনের জন্য খসড়ায় কোথাও কোথাও সামান্য গুরুচণ্ডালীর আভাস পাওয়া যায়। দিনলিপি বা গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে কখনো এমন নেই।

(গ) Settlement Officer : একজন নব্যধরনের উচ্চশিক্ষিত তরুণ যুবক—সব সময় চাকরির উন্নতির চেষ্টায় ব্যস্ত—Provincial Excecutive Service-এ ঢুকেচে, খুব চালাক, চটপটে, ব্যস্তসমস্ত, চতুর, মনও বেশ, কিন্তু সবসময় কেবল এর ওর সুনজরে পড়বার চেষ্টা... career-এর উন্নতি...ভাবপ্রবণতা আদৌ নাই—খুব কার্যদক্ষ। হু হু উন্নতি।[৪]

(ঘ) রায় মহাশয় (?) : Sensitive soul, absorbed in self-communion and in the contemplation of the beauty in creation, a very pure and supersensitive souldinnocent but suffering—solitary walks by the riverside—meadows, woodland paths glimpses of the Great Beyond—a soul of a very rare type—not of this world.

(ঙ) নবীন মজুমদার : একজন পাড়াগাঁয়ের বৃদ্ধ ভদ্রলোক, খামখেয়ালী, অদ্ভুত ধরনের, নিজের বংশগৌরব নিয়ে খুব ব্যস্ত—ছেলে নিরুদ্দেশ, আর আসে না—শেষদিন পর্যন্ত তারই অপেক্ষা...পাঞ্জা নিয়ে ঘোড়-সওয়ার ছুটে আসছে...দোয়া গাজী আলমগীর—বাদশাহী ফর্মান—ঝাউবেড়ের মজুমদারেরা—[৫]

(চ) এক বৃদ্ধা—বয়স খুব বেশি, (,) ৮০-র কাছাকাছি, কালা ও অন্ধ, সব মরে হেজে গিয়েচে—আগের লোক কেউ নেই—একা একা বসে থাকে, সকলে যা যা, দূরছাই করে, হেসে যদি বলে—এখানে তোদের খেলা দেখতে এলাম (,) সকলে হেসে হাততালি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়— অতীতের এক জীর্ণ কঙ্কাল (,) কিন্তু জীবন্ত, এখনো মরেনি..(বীরেশ্বরবাবুর grandmother) [৬] ।

(ছ) এক পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত গৃহস্থ বধূ—অসুখী, দরিদ্র, অসাধু, কলহপ্রিয়া, ছেলে নিয়েবড় সুখী ও ব্যস্ত, বড় দরিদ্র, stealing (পড়া যাচ্ছে না) as means of livelihood for the sake of the son.[৭]

(জ) এক ছোট্ট ছেলে (অপু—model)

[খসড়ার মধ্যে আর একটি কৌতূহল-উদ্রেককারী পাতা পাচ্ছি।

'পথের পাঁচালী'-র প্রচলিত সংস্করণে আছে হরিহর বিবাহের পর বেশ কিছুদিন গৃহত্যাগ করে উদাসীন জীবনযাপন করেছিল। পরে পশ্চিমভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সে শ্বশুরবাড়ি যায় এবং সর্বজয়াকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে এসে সংসার পেতে বসে। এই অংশটি রচনা করবার সময় বিভূতিভূষণ বাপের বাড়িতে সর্বজয়ার জীবন, তার শৈশব এবং অকিঞ্চিৎকর মেয়েলী সাধের বিবরণ দিয়ে একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। কোনো কারণে মূল উপন্যাসে এই খসড়া বর্জিত হয়। কিন্তু এই ছোট্ট অংশটিতে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রবঞ্চিত মানুষের প্রতি প্রকৃত মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। খসড়াটি তুলে দেওয়া গেল :-]

"ছেলেবেলায় সে নিজের হাতে মাটির পুতুল গড়াইয়া রৌদ্রে পোড়াইয়া তাকেই লইয়া খেলা করিয়াছে। পরের বাড়ি হইতে পেয়ারাটা, বেলটা, কলাটা চুরির অভ্যাস তাহার বরাবর ছিল, এখনো আছে। এজন্য সে বহুবার বহু অপমান সহ্য করিয়াছে—কিন্তু লোভে ও অভাবে পড়িয়া চুরির অভ্যাস সে ছাড়াইতে পারে নাই। ইদানীং দুঃখের সংসারে অভাবে চেহারা তেমন না থাকিলেও পূর্বে সে দেখিতে বেশ সুন্দরী ছিল। সুন্দর টকটকে রং। বেশ বড় বড় চোখ, মুখের গড়নও ছিল বড় ভালো। তাহার সৌন্দর্যের এই দিকটা তাহার ছেলেকে বর্তিয়াছে—যদিও দুর্গার রং তেমন টকটকে ফর্সা না হইলেও মুখের গড়ন ও চোখ বড়

[৪]এই চরিত্রের আদলটি বিভূতিভূষণ পরে উপন্যাসে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তাঁর কুয়াশার রঙ,'উন্নতি' বা 'রাক্ষসগণ' গল্পে এই ধরনের একটি চরিত্র ঘুরেফিরে এসেছে।

[৫]Shelley-র মত বিভূতিভূষণেরও দ্রুত মিথ তৈরি করবার ক্ষমতা ছিল। মাত্র দু-একটি বিশিষ্টবাক্যে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য, মহাকালের অমোঘ গতি, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, শৈশবস্মৃতি, ইতিহাসচেতনা ইত্যাদিকে একসূত্রে গ্রথিত করে কাব্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারতেন। এখানেও হয়তো কোনো ঐতিহাসিক myth তৈরি করবার কথা ভেবেছিলেন। যেমন হরিহরের পূর্বপুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের কাহিনীতে রয়েছে। কিন্তু পরে এই অংশ পরিত্যক্ত হয়।'পথের পাঁচালী'তে আলমগীরের কোনো উল্লেখ নেই।

[৬]সম্ভবত ইন্দির ঠাকরুণের চরিত্রের প্রথম রূপরেখা। বন্ধনীর মধ্যে শব্দ দুটি দেখে অনুমান করা যায়খসড়াটি কোনো পরিচিত চরিত্রনির্ভর।

[৭]সর্বজয়ার চরিত্রের প্রাথমিক রূপরেখা। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত—এই কুশীলবের তালিকায় উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির প্রায় সবারই উল্লেখ রয়েছে, একমাত্র দুর্গা ছাড়া।

সুন্দর।[৮] বিবাহের সময় তাহার বাবা তাহাকে যে নূতন টিনের পেঁট্‌রাটা কিনিয়া দেন, পাড়ার এক দূর সম্পর্কের দিদিমা তাহা সাজাইতে গিয়া দেখিলেন যে (,) তাহাতে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর আনুষঙ্গিক উপকরণ স্বরূপ কোনো সখের দ্রব্যই নাই; না একজোড়া তাস, না কোনো গন্ধদ্রব্য, না কিছু। সর্বজয়া গন্ধতেল মাখিতে বড় ভালোবাসিত। নারিকেল তৈলের সহিত মেথি আরো কি কি মশলা মিশাইয়া তাহার মা মাঝে তেল তৈয়ারি করিয়া মাখিতে দিত। কেবল সেই (একটা) বড় বোতল গন্ধমিশানোনারিকেল তৈল ছাড়া অন্য কোনো সখের দ্রব্য বাক্সে ছিল না। দিদিমা তাহাই দেখিয়া ১০/১২টি বড় বড় কাচের পুতুল বাক্সে ভরিয়া দেন।

"শৈশবে যে সাধ মিটে নই, সর্বজয়ার মনে তাহা অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছিল—বেশি বয়সে সে তাহা পাইল। শ্বশুরবাড়ি আসিয়া সকলের চেয়ে সে ভালোবাসিল এই কাচের পুতুলগুলিকে। বার বার বাক্স হইতে বাহির করিয়া সেগুলি দেখিত—আবার যত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিত। বড় হইলে ছেলেপিলে হইয়া গেলেও এখনো তার সেই কাচের পুতুলগুলির উপর একটা একটা (প্রমাদবশত এখানে "একটা" শব্দটি পরপর দুবার লিখেছেন) মায়া আছে, এখনো সেগুলি তাহার সেই বাক্সের মধ্যেই বন্ধ আছে। ছেলেপিলেদের মাঝে মাঝে বাহির করিয়া দেখায়। কিন্তু দেয় না—পাছে ভাঙিয়া ফেলে। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে দুর্গার বিবাহের সময় সেগুলি যৌতুক দিবে।[৯]

"সর্বজয়ার চোখের সামনে এক অপূর্ব জগতের দৃশ্য প্রথম খুলিয়া গেল সেদিন—যেদিন অপু[১০] জন্মিল। সে আনন্দের কথা সে কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। কাজের ফাঁকে বসিয়া বসিয়া (খসড়ায় "বসিয়া ২" এইভাবে পুরনো রীতিতে লেখা) সে আজকাল শুধু সেই দিনগুলির কথা ভাবে।"

* * *

[এবার আর একটি পাতা, তারিখ—১৬.১২.২৬; তারিখের পরেই বন্ধনীর মধ্যে লেখা—Bha., অর্থাৎ ভাগলপুর। পত্রশীর্ষে ইংরেজি শিরোনাম—Scheme। এই খসড়ায় পরিকল্পনা কিছুটা অবিন্যস্ত, কালানুক্রম সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। 'পথের পাঁচালী'-র বর্তমান পাঠে অভ্যস্ত পাঠকদের বিস্ময়ও জাগবে, কারণ এখানে লেখক অন্যভাবে রচনাকে এগিয়ে নেবার কথা ভেবেছেন—মুদ্রিত উপন্যাসের থেকে যা আলাদা। খসড়াটি এই :]

Scheme

"বইখানার প্রথমে পাড়াগাঁয়ের দৃশ্য থেকে আরম্ভ। গাছপালা, ঋতু (?), ফুল, ফল (?), পল্লীপ্রকৃতি। জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখ। অপু, তার মা, দিদি ও বাবা থাকে। তার শৈশবের (এখানে জং ধরা জেম ক্লিপের দাগ থাকায় একটি শব্দ পড়া যাচ্ছে না) প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয়। নীরেন্দ্র আসিল। তার দিদির সঙ্গে বিবাহের কথা। বধূর[১১] কথা (?), রাণু, অন্য দু-একজন পাড়াগেঁয়ে quaint ধরনের মানুষেরা। দিদি মারা যায়। তার পরেই অপুর দিদির কথা মনে হয়, নাটাফল, যখনই বনের ধারে ছায়া পড়ে আসে, তখনই দিদির কথাই (?)যে মনে হয়...তাকে কত বকুনি, কত গালাগাল। কত মার কাছে মারধোর...কোথায় সে ?

"রাত্রে শুয়ে শুয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ফিরে আয় দিদি...ফিরে আয়...

"ওর বাবার মৃত্যু হলে, বিদেশযাত্রা। প্রথম ট্রেনে পা দিয়েই দিদির কথা, সেই রাতটি মনে হল। সব পিছনে পড়ে রইল। দিদির বিরহ যেন নতুন করে ফিরে এল। এতদিন অপূ ও দিদি ছিল...অপু ও তার (দিদির) স্মৃতি মাখানো ঘরদোর...

"ট্রেন হু হু চলল।

---

[৮]দুর্গার উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় এই খসড়াটি নবপর্যায়ে 'পথের পাঁচালী' শুরু করার পরে লিখিত। তারিখ সম্ভবত ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক।

[৯]বালিকার মনের মধ্যে বড় হয়ে সংসার করবার সাধ সুপ্ত থাকে। পুতুলখেলা তারই বাহ্যিকপ্রকাশ—মনস্তত্ত্ববিদদের এই অভিমত। সেদিক দিয়ে এই খসড়ায় বিভূতিভূষণের মানবচরিত্র সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে।

[১০]খসড়ায় প্রায় সর্বত্র বিভূতিভূষণ বানান লিখেছেন-"অপূ"পুরো নাম "অপূর্ব"—বোধহয় তারই অনুসরণে।

[১১]অন্নদা রায়ের পুত্র গোলোকের স্ত্রী। বিভূতিভূষণ নিবিড় মমতায় এই চরিত্রটি এঁকেছিলেন।

"বড়লোকের বাড়ির কাণ্ডকারখানা। কতদিন পরে আবার ফিরে। সেই পুরানো বাড়িঘর। সেই গাছপালার গন্ধ, পথের ধারে বাঁশপাতা পুরোনো দিনের মতো ঘুরে ঘুরে উড়ে। জীবনের আনন্দ উছলে ওঠে। গ্রামে একঘর নতুন গৃহস্থ এসেছে। তাদের নতুন অনেক বই। 'অপূর্ব ভ্রমণ'..বঙ্গবাসী...ওকে কেউ লেখাপড়া শিখায় না...ছেঁড়া পাত প্রাকৃতিক ভূগোল..কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া পাতা যত্ন করে ঘরে তুলে রাখে...নদীর ধার...আর সকলে পড়ে, স্কুলে যায়, ক্লাস প্রমোশন পায়, সভায় মজ্‌লিসে ও মুখ পায় না। কিন্তু প্রকৃতি ওর পড়ার ভার নিলে... পৈতে—পেঁপেতলায় দিদি—পরে স্কুলে গেল। মা ও ছেলের স্নেহ। College-এ গেল। পূজায় বাড়ি আসে। Home sickness (এখানে বন্ধনীর মধ্যে কয়েকটি শব্দ পড়া যাচ্ছে না)...কত ধরনের ছেলেপিলে। A poor scholar... পূজায় বাড়ি এসে মা ও সে কত রাত ধরে ভবিষ্যতের ছবি আঁকে রঙ্গীন তুলি দিয়ে। মা আগে যেমন শিষ্যবাড়ির ছবি দেখত, ঐরকম ছবি দেখে। সে স্বপ্নই দেখলে চিরটা কাল। মারা যায় একদিন। সোনা করা জাদুকর...ঝুলি নিয়ে ঘোরে, ছেঁড়াখুড়া (ছোঁড়াখোঁড়া ?) কাপড় (,) কিন্তু পেতল থেকে, রাং থেকে (সোনা করে থাকে)...বধূ ?...অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ আশ্রয় দেয়। মায়ের মতো দ্যাখে। আগেও যখন প্রথম গ্রামে আসে, তখনো ওই আশ্রয় দেয়।বলে এতদিন ছিলে না। পাড়া ছিল অন্ধকার...সেজ ঠাকরুণ তত সন্তুষ্ট হয় না। অপূর স্বাধীন জীবন। পড়ে শুনে (পড়াশুনা করে ?)। Astrophysics. বিবাহ করে। স্ত্রী মারা যায়। চিঠির ডাক খুলে (খোলে ?) পাড়াগাঁয়ের এক পোস্ট অফিসে।[১২] মোটে এক ছেলে—অনেক দূর—আবার একবার গ্রামে যায়। কত পরিবর্তন হয়েছে। দূরে বিদেশেই থাকে। বাইরে বাইরে বেড়ায়—wild cosmopolitan life—(এখানে বন্ধনীর মধ্যে লেখা—এখান হইতে অপর পিঠ [?]পড়ো', এবং তারপর একটি তীরচিহ্ন দেওয়া) অনেকদিন পরে নীরেন আবার আসে। অপূর ছেলেকে স্থান দেয়, সে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরছিল, পরের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে, আবার যেন অপূ ফিরে এসেচে।

"নীরেনের জীবন ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে...পয়সা খুব উপার্জন হয়েছে বটে কিন্তু ততঃ কিম ?...

"সে অপূর কথা বুঝলে।

1. Salvation in nature.

2. আনন্দ দেবার জন্যেই এ জগৎ, এ ফুলফল, এ প্রাচীন পুষ্পিত সপ্তপর্ণ। কিন্তু তাকে দেখে কে ?...মাথা তুললেই একবার তাকালেই মাথার ওপরে অনন্ত, সবসময় তোমার দেখ্‌বার অপেক্ষায় রয়েছে...অনন্তের ডাক কানে যায় কজনের ?...

3. "Psychology of আনন্দ। উপকরণের সঙ্গে (,) অবস্থার সঙ্গে আনন্দের কোনো সম্পর্ক নাই, অবস্থার সঙ্গেও নয়। চাঁদ যেমন সকলের ঘরেই জ্যোৎস্না পৌঁছে দেয়, জগতের আনন্দভাণ্ডার তেমনি করেই ঘরে২ (ঘরে ঘরে) সকলকেই পরিপূর্ণ আনন্দ আস্বাদ করাচ্চে...সবসময়, সবসময়... কেবল মানুষে সেটুকু বুঝতে পারে না...ভাবে ওর আনন্দ বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি। উপকরণের আড়ম্বরে, ভোগসুখে আনন্দ পাবার ধার ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে আসে ক্রমশঃ...Simple enjoyments...simple joys of life...

4. কেবল চিন্তা, শিল্প-সৌন্দর্যের-শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের আনন্দ উপরের আনন্দের চেয়ে বেশি। এটা একটু অন্যরকম। Trained মন ভিন্ন এ ধরনের আনন্দ সকলের জন্যে আসে না।

5. Love-Sincerity-Truth.

"অপূ কবি হইয়াছিল—তাহার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে জগতের জন্য সে কি দিবে ?..তার লেখা নোট্।"

[অনন্ত মহাকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বোধ করা, মহাকালের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত অনন্ত মহাজীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি এবং সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে চিরসাময়িকতাকে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষাই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের মূল লক্ষণ। এই কারণেই তাঁর রচনায় 'মহাবিশ্ব', 'মহাকাল', 'সহস্র বছর', 'নীহারিকা', 'joy of life' এই ধরনের শব্দগুলি বার বার ফিরে আসে। সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা যে প্রেম, ত্যাগ এবং আসক্তিহীন কর্মের বাণী প্রচার করেছেন, বিভূতিভূষণের রচনাতেও সেই একই সুর ধ্বনিত। এই বক্তব্যের সপক্ষে খসড়া থেকে একটি পাতা তুলে দিচ্ছি:—

[১২]খসড়ায় বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'-র কাহিনী অতিক্রম করে 'অপরাজিত'-র আখ্যানভাগেওপ্রবেশ করেছেন। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপু একাকীত্ব কাটানোর জন্য একটি ডাকঘরে বসে চিঠি লিখতো।

"ভগবান থাকেন ওই আকাশে...আজকার দুঃখ কালকার দুঃখ কিছুই নয়...জ্বলজ্বল শুকতারা যেখানে জ্বলে, ধূমকেতু যেখান দিয়ে দোলে (?), ওই তার গতিপথ...ওই অসীম অনন্ত শূন্য তাঁর প্রতীক...তাঁর বিচার আসবে...তবে একটু দেরিতে আসে...

"দুঃখসুখ কদিনের ?

"আজ কাল পরশু (দুটি শব্দ পড়া যাচ্ছে না)। ৫,০০০ বছরের পরে এই পৃথিবী গাছপালা কত বদলে যাবে...কোথায় থাকবে তুমি, কোথায় থাকবো আমি ও আমার দুঃখ ?অনন্তকালের রথযাত্রায় বিশাল লীলাস্রোত অবিরাম চলেচে—সাথে সাথে সুখদুঃখ, প্রাণীজগৎ স্বপ্নবৎ উঠচে, পড়চে—কে কোথায় যাবে ?কে কোথায় থাকবে ?আজকের অশ্রুবেদনা ভরা ঐ লেবুফুল, এই করুণ তানে ভরা মধ্যাহ্ন কোথায় মিলিয়ে যাবে। ওই গাছপালা অন্ধকার খনিগর্ভে চুনাপাথর ও জীবাশ্ম হয়ে রইবে...দুদিনের ঐশ্বর্য সুখ অশ্রু খেলাধূলা জয়পরাজয়।

"অনন্তের মেঘমন্দ্র ভেরী শুনেচ ?...

"দুপুররাত্রে কালো আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রজগতের দিকে চেয়ে থেকো, অনন্তের ধ্বনি তোমার কানে বাজ্‌বে...।

"অনন্তের ডাক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক...তা যদি শুনে থাকো, তবে জগতের দুদিনের সুখদুঃখ জয়পরাজয় হাসি অশ্রুর মাধুর্য ও অকিঞ্চিতত্ব (?)বুঝ্‌বে...

"ওই অনন্তের ধ্বনি তোমার কানে বাজুক...বাইরে এসে শোনো—শুনতে পাবে...বদ্ধ বায়ু বিলাসিতার উপকরণ ফেলে নীল আকাশের নীচে এসে দাঁড়াও...মনকে উদার করো...সংকীর্ণ স্বার্থ দূরে ফেলে দাও...

"অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্যে উল্কারাশির যে গতিবেগ, তোমার নিজের শিরায় উপশিরায় তার মহিমা। বেশ বুঝতে পারবে...নীহারিকাপুঞ্জের অগ্নিতেজ (?)তোমার আত্মায় দীপ্যমান হয়ে ফুটবে...নিঃসীম নীল আকাশের মতো তোমার কল্পনা বাধাশূন্য, দূরপ্রসারী হবে...প্রথম শ্রাবণের বর্ষাধারার মতো সিক্ত ও সরস হবে তোমার হৃদয়...X-Ray, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বক, তোমাতে মূর্তিমান হয়ে প্রকাশিত হবে..."

এ খসড়ায় নিজের লেখা। এই পর্যন্ত। এরপর একটি ইংরেজি উদ্ধৃতি :—

"An incident has no value in itself; it is exactly as interesting as the artist makes it."

[উদ্ধৃতি যাঁর রচনা থেকে, তাঁর নামও নিচে লেখা রয়েছে বটে, কিন্তু সঠিকভাবে পড়া যাচ্ছে না। প্রথম নাম Percy, পদবী জটিল হস্তাক্ষরের জন্য দুষ্পাঠ্য। রচনার নামও সঙ্গে রয়েছে।

'পথের পাঁচালী'র মূল জীবনদর্শন এই কটি পংক্তিতে বিধৃত। অবাক হয়ে দেখি, এই বক্তব্য আজও কত প্রাসঙ্গিক। শাশ্বত প্রাসঙ্গিকতাই তো একটি গ্রন্থকে চিরায়ত করে]

*　　*　　*

[খসড়ার ওপরে তারিখ—Bha, 8.8.26, অর্থাৎ ভাগলপুর প্রবাসে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই আগস্ট রচিত। সরাসরি এটিকে মূল উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করা কঠিন, কারণ এই পাতাটিতে'পথের পাঁচালী'-র কোনো চরিত্রের বা ঘটনার উল্লেখ নেই। লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং রোমান্টিক কল্পনার প্রতিবেদন এই অংশে বিবৃত। উপন্যাসেও বিভূতিভূষণ অপুকে একই রোম্যান্টিক চেতনার অধিকারী করে গড়েছেন। বোঝা যায়, অপু চরিত্রের যথাযথ বিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজনে তিনি অনেক ভেবেছেন, নোট নিয়েছেন, নানারকম পরিকল্পনা করেছেন। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' রচনাকালে এর চরিত্রগুলি তাঁকে কতদূর আবিষ্ট করে রেখেছিল তার বিবরণ তিনি নিজের দিনলিপিতে রেখে গিয়েছেন। কাজেই আপাতসংযোগহীন বলে প্রতীয়মান হলেওপ্রকৃতপক্ষে এই ধরনের খসড়াগুলি উপন্যাসের আসল মালমশলা।

এই অংশটিতেও বিভূতিভূষণের 'myth'তৈরি করার ক্ষমতার পরিচয় পাচ্ছি। কখনো প্রাচীন ভারতবর্ষ, কখনো গ্রীস, কখনো বা প্রাচীন মিশরে নীলনদের তীরে অনায়াসে বিচরণ করেছে তাঁর কবিকল্পনা।

খসড়াটি এইরকম :

"সে[১৩] নিভৃত রাত্রে তার ঘরে বসিয়া পড়িত। বাইরের ছাদে অন্ধকার রাত্রের মাথার ওপরে অনন্ত গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ—তারই মধ্যে।...

"কত কল্পলোকের প্রাণী ! কত অদৃশ্য পদধ্বনির মৃদু যাতায়াতের ছন্দ ! সারাদিন ধরিয়া সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম, অলসবেলা কাটিয়া চলে, কত কে যায় আসে, তাহার যাতায়াত শেষ হয় না... অপরাহ্নের ছায়া বকুলবীথিতে স্নিগ্ধতা আনিয়াছে...কিসের গুঞ্জন ও ?...ঋষিকন্যা শকুন্তলা আলবালে জলসেচন করিতেছেন...বল্কল তার ক্ষীণ কটিতে বিস্রব্ধ(?), অঙ্গবাস শিথিল—ভ্রমর কেন বিরক্ত করিতেছে ?

"কালিদাস—বৃদ্ধ, প্রাচীন কালিদাস—তমালতলে বসিয়া...তাঁর মানসকন্যা এখনো জলসেচন করিতেছে ?—পাগলী, বাড়ি যা—তুই কি বিশ্রাম করিবি না ?...কন্যা হাসে...বৃদ্ধ পিতার শুক্লক্লেশ স্নেহহস্তে গুছাইয়া দেয়..কালিদাসের চোখ দিয়া জল পড়ে...পাগলী...এবার তোর বিয়ে শীগ্‌গিরিই দোব—দুষ্মন্তের (সঙ্গে) —

"দ্যাখো বাবা—ও রকম কর্ল্লে কিন্তু—কৃত্রিম ক্রোধভরে তর্জনীশাসনে মেয়ে ছুটিয়া পালায়...

"হাজার বছরের কুয়াশা ঘিরিয়া আসে—তমালতল মুছিয়া যায়—বৃদ্ধ কবিকে আর দেখা যায় না...

"জ্যোৎস্না...জ্যোৎস্না...তরুণতরুণী সুখের হাসি হাসে...এম্‌নি দিনে

"সেদিন[১৪] জন্মস্থান স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন-অ্যাভনে অনেক লোক। কবি হাসেন—পোর্সিয়া...জেসিকা তোমরা বড় দুষ্ট !...এখন একটু চুপ কর...

"নববর্ষের বরফ পড়িয়াছে...এল্‌ম, ওকগাছের পাতা সাদা...কেআসে—দীর্ঘ,যুবক—ভারীচমৎকার হাসে...চিরদিন দুঃখী...চিরদিন উদার...চিরদিন হাসিমুখ—টম্ ট্রাড্‌ল্‌স্[১৫] ! ...ডিকেন্স, (অমর কবি)...মহাস্রষ্টা, যুগে যুগে (তার) বাঁশী বাজবে...কিন্তু ছোট এমিলির[১৬] ম্লানমুখ এখনো দেখো কেন ?ওর কি হল ?

"এখানে কে একজন বিকৃতমস্তিষ্ক উদারপ্রাণ পুরুষ ময়দার কলের বাতাসের পাখার সঙ্গে যুদ্ধ কর্চে[১৭] ...

...আশা, আনন্দ, দুঃখ, স্মৃতি, হর্ষ, শোক, নিরাশা, মৃত্যু,চিরযৌবন,চিরত্রাসের ইন্দ্রজাল ও সঙ্গীত...চিরদ্রাক্ষাকুঞ্জের চিরযৌবনা দেবদেবী, চিরতরুণ ওরা...

"ওই ছোট্ট ছেলেটাকে চেন ?...অ্যাসপ্যারাগাসের বেড়ার আড়ালে একবার মুখ লুকুচ্চে—একবার হাস্‌চে—আর একবার মুখ লুকুচ্চে ?...প্রিন্স নিকোলাসের ছেলে[১৮] (,) পিতৃমাতৃহারা ছোট নিকোলাস...ওকে কোলে করে নাও—জগতে ওর কেউ নেই...তবু ও হেসেবেড়ায়, অবোধ শিশু...নিজের সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ বোঝে না...টলস্টয়...ওর পালিত (পালক) পিতা ককেশাস প্রদেশে যুদ্ধে গিয়েছেন, ফিরে এলে তাঁর কোলে তুলে দিয়ো...

"শান্ত, গ্রাম্য নদীর ধারে একটা সমাধি আছে। কেউ চেনে না, কেউ জানে না...দীর্ঘ দীর্ঘ বুনো ঘাসে ভরে গিয়েচে...সেখানে চিরদুঃখী লুইসী শুয়ে আছে...গভীর রাত্রের অন্ধকারে..."

||২||

পাণ্ডুলিপি অংশ

['পথের পাঁচালী'-র প্রচলিত সংস্করণে আছে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে হরিহর চলেছে কাশীতে। সেখানে হরিহরের মৃত্যুর পর সর্বজয়া বর্ধমানের রায়চৌধুরী বাড়িতে আশ্রয় পাচ্ছে। এখান থেকে 'অপরাজিত'-র শুরু। রায়চৌধুরী পরিবার থেকেই

---

[১৩]এই সর্বনামটির পরিচিতি সম্বন্ধে দুটি সম্ভাবনা আছে। খুব সম্ভব এই "সে" হচ্ছে "অপু"।আর একসম্ভাবনা—এই মানুষ স্বয়ং বিভূতিভূষণ। ভাগলপুরে বড়বাসার ছাদে বসে কল্পিত স্বপ্নলোকের বর্ণনা।

[১৪]এখানে "শেক্‌স্‌পীয়রের" শব্দটি বসালে পাঠ সম্পূর্ণ হয়।

[১৫]ডেভিড কপারফিল্‌ড্ উপন্যাসের চরিত্র।

[১৬]Little Emily—ডেভিড কপারফিল্‌ড্ চরিত্র।

[১৭]সার্ভেন্টিস (Cerventes) রচিত ডন কুইজোট উপন্যাসের নায়ক (Don Quixote)। যুদ্ধবাতিকগ্রস্ত এই মানুষটির হাওয়াকল বা উইন্ডমিল দেখে দৈত্য মনে করে তেড়ে যাওয়া নিয়ে একটি ঘটনা উপন্যাসে বর্ণিত আছে। বহুভাষাবিদ বন্ধুরা বলেন—লেখকের নামের উচ্চারণ 'থেরভান্‌তেস্', এবং নায়কের নাম 'ডন কিয়োটে'।

[১৮]টলস্টয় রচিত 'ওয়ার অ্যান্‌ড্ পীস' উপন্যাসের চরিত্র।

সর্বজয়া এবং অপুকে খুঁজে বের করে মনসাপোতা নিয়ে যান সর্বজয়ার দূরসম্পর্কের মেসোমশাই। এ ঘটনা 'অপরাজিত' শুরু হবার বেশ কয়েক পরিচ্ছেদ পরের। কিন্তু বাতিল পাণ্ডুলিপির যে অংশ উদ্ধার হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি হরিহর নিশ্চিন্দিপুর থেকে সরাসরি মনসাপোতা যাচ্ছে সপরিবারে। এ যোগাযোগ কিভাবে হল তা বোঝা সম্ভব নয়, কারণ পাণ্ডুলিপির এই অংশের প্রথম কয়েকটি পাতা নেই। যেটুকু পাওয়া গিয়েছে তার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ তুলে দেওয়া গেল। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বন্ধনী বা টিকা ব্যবহার করেছি।]

"আট-দশদিন কাটিয়া গেল। সর্বজয়া ঘরবাড়ি মনের মতো নিকাইয়া মুছিয়া লইয়াছে। তেলি বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব জমিল। তাহাদের বাড়ি হইতেই জিনিসপত্র সব আসে। তেলিগিন্নিও বোধহয় বহুদিন পরে কথা কহিয়া বাঁচিল। বৈকালে এ বাড়ি তাহার আড্ডা দেওয়া বাঁধা হইয়া গিয়াছে। একপ্রহর রাত পর্যন্ত উঠিবার নামও করে না।

"কথাবার্তায় ক্রমে জানা গেল যে তেলি বাড়ির লোকজন বৎসরের মধ্যে নয় মাস কলিকাতা থাকে। সম্প্রতি কলিকাতায় প্লেগের উপদ্রব হওয়ায় গত ফাল্গুন মাস হইতে দেশে আসিয়া আছে। বৈশাখে আমকাঁটাল ফুরাইলে আবার কলিকাতায় রওনা হইবে। ইহাদের বাড়ি চৌকী দিবার জন্য একঘর লোককে বাড়ির নিকটে বসানোর দরকার বলিয়া এবং কতকটা গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস আদৌ নাই বলিয়াই ইহারা এত আগ্রহ করিতেছে।

"আষাঢ় মাসের দিকে বর্ষা পড়িল। গ্রামের বনজঙ্গল একেই অত্যন্ত বেশি, তাহার উপর মজা ডোবা, পুকুর—গণনায় কুলানো যায় না। সকলেই নিজের নিজের বাড়ির পিছনে ছোট ২ (ছোট ছোট) একটি (?)ডোবা খুঁড়াইয়াছে। কেন, তাহা বুঝা সুকঠিন। দুই তিন বর্ষায় জল পাইয়া ডোবা পুকুর পুরিয়া উঠিল। বাঁশবন তত নাই, কিন্তু তেঁতুলবাগান বড্ড বেশি। পথেঘাটে কাদা, পিছল। বনে জঙ্গলে পাতা পচিয়া মশার উপদ্রব বাড়িল চারিগুণ।

"হরিহর খুব স্ফূর্তিতে থাকে।[১৯] অনেকদিন পরে সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তেলিবাড়িতে গৃহবিগ্রহের নিত্য পূজার ভার তাহার উপর। সংসারের খরচের জিনিসপত্র তাহারা যোগায়। অনেকদিন পরে হরিহর আবার বসিয়া বসিয়া অনেককালের পুরানো খাতাপত্র বাহির করিয়া লেখে। সর্বজয়া হাসিমুখে বলে—দেখ্‌লে ?তোমায় কত করে বলিচি বল দিকি ?...বলি (.) বাড়ি থেকে বেরোও বেরোও, গাঁ ছাড়ো। বেরুলেই পুরুষমানুষের লক্ষ্মী— তবুও যা'হক্ একটা বড়লোকের আশ্রয় তো পাওয়া গেল ?

"হরিহর সোৎসাহে বলে—খাতির কি !...পুজো করে আসি—গিন্নি বাড়ির মধ্যে থেকে বলে পাঠায় যে জল না খেয়ে যেতে পারবেন না। বেলা হয়ে গিয়েচে—আম, আনারস, মিছরীর সরবৎ—বাতাসা—তা খুব ! এরকম সচ্ছলতার সঙ্গে দেখাশুনা সর্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সে খুশির সহিত বলে—আর তোমার নিশ্চিন্দিপুরে ?লোকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে না কি খেলে কি না খেলে—কি কষ্টটাই গিয়েচে আর বছর বর্ষাকালটা !...আহা কি দেশই তোমাদের—কি বুঝে যে শ্বশুর বাস করেছিলেন তা ভেবে পাই নে—পরশু যে নৈবিদ্যি পাঠিয়েছিল তাতে ছিল আঙুর—অপূ বলে (.) একি মা ?বললাম আঙুর—আঙুর—খেয়ে দ্যাখ্—খেয়ে বাছা যা খুশি—আহা কখনো কোনো ভালো জিনিস হাতে দিতে পারিনি—এইবার ভগবান মুখ তুলে বোধ হয় চেয়েচেন—এদের ধরে থাকো, লোক বড় ভালো—গিন্নি কাল বলেচে—মাঠাক্‌রুণ, তোমার হাতে তো দুগাছা কড় মোটে, আমার ইচ্ছে গাছ কতক সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিই—বলছিল (।) বেশ লোক গিন্নি—সেদিন মেজমেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ষষ্ঠী (কাটায়) আম পাঠিয়েছে। তা এখানে অমনি ৪টে পাঠিয়েছে—মন ভারী ভালো—আমি মা বলে ডাকি—

"গ্রামে ব্রাহ্মণ তো নাই-ই, ভদ্রলোকও নাই। চাষি কৈবর্ত ও সদ্‌গোপের বাস। কেবলমাত্র একঘর তেলির বাস। হরিহর একখানা বাঙলা মহাভারতের শান্তি পর্ব লইয়া গিয়া গণেশ সঙ্গে নিয়া বাইরের ঘরে গিয়া মাঝে মাঝে বসে। সেখানে সন্ধ্যার পর গ্রামের লোক দু পাঁচজন একত্র হইয়া গল্পগুজব করে। মোটা দা-কাটা তামাক সাজিয়া নিতাই মাল তাহার হাতে দিয়া বলে—নেন্ দাঠাকুর—পরে আগ্রহ করিয়া বলে—দাঠাকুর যখন আমাদের এ গাঁয়ে বাসই কর্তে এসেছেন, তবে এখানে কিছু জমি করুন দাঠাকুর—বলেন তো কিছু জোগাড় করে দিই—কিছু না (,) একটা লোক রেখে বেগুন করান, গোয়াড়ি পাঠিয়ে বিক্রি করলে মাসে ত্রিশটে টাকা কেউ নেবে না—আর বছর আমার ভিটেজমিতে বেগুন দিইছিলাম—তা বল্লে বিশ্বাস হবে না (,) এক এক গাছে সওয়া কুড়ি দেড় কুড়ি করে বেগুন—[২০]

---

[১৯]প্রচলিত সংস্করণে এখানে হরিহরের থাকার কথাই নয়। কাশীতে তার মৃত্যু হয়েছে।

[২০]এই অংশটি এখানে বাতিল হয়েছে বটে, কিন্তু বহুকাল পরে রচিত লেখকের শেষ উপন্যাস 'অশনিসংকেত'-এর নায়ক গঙ্গাচরণের সংসারনির্বাহের চিত্র এরই আদলে গঠিত বলে মনে হয়।

"উদ্ধব ঘোষ বলে—সেদিন আর নাই নিতাইমামা—খোড়ো বাজারে পাইকের জুটেচে পঞ্চাশটা—গাঁয়ের ক্ষেতোয়ালকে টিক্‌তে দ্যায় না—পাঁচ টাকা করে মন সাড়ে পাঁচ টাকা করে মন দর দ্যায়। হুড়্‌হুড়্‌ করে সব মেপে ছালাবন্দী করে তোলে—হরিহরের হাতের হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া কলিকাটায় জোর দম দিয়া সুখের ধূঁয়া উড়াইয়া বলে—শেষ রাত্তিরের গাড়িতে হয়েচে আজকাল ভারী সুবিধে। সব কল্‌কাতা নিয়ে গিয়ে তোলে—ক্ষেতোয়াল কি বাজ্‌রা পেতে বেচ্‌বার সুবিধা পাচ্চে ?...রামোঃ—

"হরিহর বই খুলিয়া শান্তিপর্বে ভীষ্মের উপদেশ পড়ে। বলে—এ কাশীরাম নয়। বর্ধমান রাজবাটীর মহাভারত, ভারী শক্ত ভাষা। হুঁ হুঁ—এই শোনে না একটু ?...খানিকটা নিরুৎসাহ হইয়া যায়। নিতাই ঘোষ তখনো কিন্তু পাশের রামা গুড়ের সঙ্গে বেগুনের গল্প করিতেছে দেখিয়া হরিহর বলে—বলি ঘোষের পো (,) বেগুনের গল্প তো খুব করলে—উপজীব্য মানে জানো ?... উপজীব্য...উপজীব্য ?

"বেগুন ছাড়া অন্য উপজীব্যের সন্ধান এ পর্যন্ত নিতাই ঘোষ পায় নাই (।) কাজেই সে তাহার অজ্ঞতা স্বীকার করে। হরিহর বেদব্যাসের অপেক্ষাও মুখখানা গম্ভীর করিয়া তোলে—হুঁ হুঁ (,) তাইতো বলি ঘোষের পো, চিরটাকাল তো কাটালে পটল বেগুন করে—এখন শেষ বয়েসটা একটু ধর্মকর্ম করো—যা পড়ি একটু মন দিয়ে শোনো—এদিক ফিরে বসো—

"বেচারি নিতাই অপ্রতিভভাবে ইহার উহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। এক প্রহর রাত পর্যন্ত মহাভারত পাঠ হইলে তার পর খানিকক্ষণ কীর্তন হয়। গ্রামের ধারে চরণদাসবাবাজীর আখড়া। মাঝে মাঝে অষ্টপ্রহরী সংকীর্তন হয়। চিঁড়া দই এর খুব জোগাড় (,) কিন্তু বাবাজী আগে জাতে যুগী ছিল বলিয়া তাহার ওখানে সদ্‌গোপ ও গোয়ালারা পাত পাতে না। বাবাজীর আখ্‌ড়া হইয়া পর্যন্ত গ্রামের লোকে বেজায় কীর্তনভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চরণদাস এক একদিন আসেতআখড়ার বারোমেসে গাঁদাফুলের সহিত বেলফুল মিশাইয়া মাঝে মাঝে বড় মালা গড়াইয়া আনিয়া হরিহরের পায়ের কাছে রাখিয়া গড় করিয়া বলে একদিন —প্রভুর পায়ের ধূলো পড়বে না আমার ওখানে ? এই পুন্নিমের দিন ইচ্ছে আছে ভাগবত পাঠ হবে। নবদ্বীপের থেকে ঠাকুর লোচনদাস আস্‌বেন। মচ্ছবের সময় আস্‌তে পারেন নি, তাই বল্লেন (,) চরণ, তোমার ওখানে যাব ষষ্ঠী মাসেই—তা এইবার ঠাকুরের মতি হয়েছে, এই বুধবারে দয়া করে পায়ের ধূলো দেবেন একবার।

(এর পরের পাতার শীর্ষে পরিচ্ছেদ সংখ্যা লেখা—৩৬)

"বর্ষার পর রৌদ্র উঠিয়াছে।

"অপূ সকাল থেকে বসিয়াছিল বাড়ির সামনে সজ্‌নেতলায়। আজ কয়দিন সে জ্বর হইতে উঠিয়াছে। মুখ এখনো রোগা। সামনের ডোবাতে গোয়ালাবাড়ির মেয়েরা বাসন মাজিতেছে—নিকটেই তেলিবাড়ির রান্নাঘরের উপর ধূঁয়া দেখা যায়—সকালের রান্না চাপিয়াছে। গোয়ালাবৌ মেয়েকে ডাকিয়া বলিতেছে—ও চন্নি, তেলের বাটিটা একবার নেড়ে দ্যাখ্‌ না ?—তলা ধরে আঙার হয়ে উঠবে এক্ষুনি—

"ডোবার ওপারেই গোয়ালাবাড়ি। তেঁতুলবনের একটি ক্ষীণ লাউলতা রান্নার চালে ম্যালেরিয়া শীর্ণ রোগীর মতো তেঁতুলের ডালপালার ফাঁক দিয়া আসা সামান্য রৌদ্রটুকু পোহাইতেছে। একটা ঘিয়েভাজা কুকুর ডোবার ধারে গোয়ালাবৌ-এর বাসনের এঁটোকাঁটা চাটিবার অপেক্ষায় দূর হইতে মাটি শুঁকিতেছিল (।) গোয়ালাবৌ কড়া মাজিতে মাজিতে খুন্তীটা উঁচাইয়া বলিল—বেরো, বেরো—আ মলো যা—খাওয়াচ্চি তোমাকে ভাত—দূর হ ?—

"একখানা বড় বারকোষে করিয়া তেলিবাড়ির ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপূদের দাওয়ায় নামাইল। সর্বজয়া হাসিমুখে আসিয়া বারকোষ দেখিয়া বলিল—আজ বুঝি হাজীর সাধ্‌ !...উনি পুজো করে বাড়ি আসচেন পেঁচোর মা ?...

"পেঁচোর মা বলিল—পুজো হয়নি মাঠাক্‌রণ—স্বস্ত্যেন করে উঠলেন এই মাত্তর তো—এই আমি যাবো, সব জোগাড় আজাড় করে নিয়ে যাবো ঠাকুরঘরে—তবে তো বসা হবে পুজোয় ?বারকোষ রইল মাঠাক্‌রণ, ও বেলা দিবেন—সর্বজয়া বলিল—দেখিস মা অপূ যদি সামনে কোথাও ওদিকে থাকে, পাঠিয়ে দিস্‌ তো ?

"পেঁচোর মা বাহির হইয়া যাইতে না যাইতে অপু আসিল। সর্বজয়া একগাল হাসিয়া বলিল—ইদিকে আয় অপূ—?দ্যাখ্‌—এই দ্যাখ্‌ তোর সেই নারকোলের ফোঁপল—তুই ভালোবাসিস্‌ ?...কিসমিস, কলা, কত বড় বড় আম দেখিচিস্‌—বোধ হয় বোম্বাই আম—কল্‌কাতা থেকে এনেচে—আয় খাবি দিই—বোস এখানে—

"এত নানারকমের ভালো জিনিস সর্বজয়া কখনো নিজের আয়ত্তে পায় নাই। তাহার কতকালের স্বপ্ন ! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, তাহার অবসন্ন অন্যমনস্ক

মন যে অবাস্তব কাল্পনিক স্বচ্ছলতার ছবি আপন মনে ভাঙ্গিত গড়িত—চাল নাই, ডাল নাই, হাতে খরচ নাই, ফুটা বাড়িতে জল পড়ে বৃষ্টির রাত্রে—পাড়ায় মুখ পায় না, সকলে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে—মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না—সেসব দিনের স্মৃতির সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে ঢাকা ভগ্ন পাঁচীলের দীর্ঘ ছায়ার সঙ্গে যেসব দূরকালের দুরাশার রঙে রঙিন ভবিষ্যৎ জড়ানো দিন—এই তো এতদিনে তাহারা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।...

"অপূ কিন্তু খুব সায় দিল না। আসল কথা, তাহার—তাহার আবার বোধ হয় জ্বর আসিয়াছে। তাইতো সে এতক্ষণ ঐ সজনেতলায় বসিয়াছিল। হাই উঠিতেছে, জলপিপাসা খুব বেশি। গা মাটি মাটি। কি জানি কেন অপুর এখানে আসা অবধি মন ভালোই নাই। খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। কিসের যে অভাব তাহা ছেলেমানুষ গুছাইয়া বুঝিতে পারে না। তবুও যেন তাহার ভালো লাগে না। সর্বজয়া যে তাহা লক্ষ্য না করিয়াছে তাহা নয়। কেন ছেলে আর আগের মতো হাসে না, সেরকম উৎসাহ নাই—বুঝিতে পারে না। ইহার উপর এইবার লইয়া অপূ তিনবার জ্বরে পড়িল, দশ বারোদিনের ছাড়াছাড়ি।

"তবুও সে লোভ ছাড়িত না—জ্বর আসার কথা গোপন করিয়াই খাইতে বসিত নিশ্চয়—কিন্তু আজ সে আর বসিতে পারিতেছে না—যতক্ষণ বসিবার সাধ্য ছিল, সজ্‌নেতলায় রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া জল পিপাসা পাওয়া, শীত শীত করা, চোখমুখ জ্বালা করা, হাই ওঠা এমনকি অল্প ২ (অল্প অল্প) কম্প দেওয়াও যে জ্বরের লক্ষণ নয় এ বিষয়ে মনকে নানারূপ প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি কম্পজ্বর তাহার মন হইতে সকল প্রকার আশার ক্ষীণ আলোটুকু নিভাইয়া দিয়া সজ্‌নেতলা হইতে তাহাকে উঠাইয়া দিয়াছে। দাঁড়াইতে সে আর পারিয়া উঠিতেছে না—খাওয়া তো দূরের কথা। ম্লান মুখে কাঁপিতে ২ (কাঁপিতে কাঁপিতে) বলিল—আমার জ্বর এসেচে মা—বড্ড শীত কর্চ্চে—শুই গে—

'সর্বজয়ার মুখের হাসি নিভিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া ছেলের গায়ে হাত দিয়া দেখিল—বলিল, তাই তোরে, গা যে পুড়ে যাচ্চে ! কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?তারপর ছেলেকে আস্তে আস্তে লইয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিল।

তাহার পর যদি বা উঠিল—কিন্তু জ্বর আর ছাড়ে না। রোজ সকাল ৮টার মধ্যেই জ্বর আসে। গ্রামে ডাক্তার নাই, গুণী কবরেজ কি বড়ি দিয়া গেল। ২/৪ দিন ভালো থাকে, আবার হঠাৎ একদিন গা মাটি মাটি করে, হাই ওঠে, পরেই লেপ-কাঁথা চাপা।

"ভাদ্র মাসের শেষে সর্বজয়া জ্বরে পড়িল। একবার জ্বর ভোগ করিয়াই সে এত দুর্বল হইয়া পড়িল যে সবসময়ই তাহার মাথা ঘোরে, দাঁড়াইতে পারে না। অপূর তো জ্বর ছাড়েই না। একটু না একটু লাগিয়াই থাকে। রোজ সকালে উঠিয়া পাণ্ডাস্ মুখে গোয়াড়ি হইতে তাঁহার বাবার কিনিয়া আনা বেজায় তিক্ত কি একটা বোতলের ঔষধ খায় আর সারাদিন শুধু নানা কুপথ্যের স্বপ্ন দেখে। হরিহরও জ্বরে পড়িল। ওদিকে তেলিবাড়ির সকলেই প্রায় বিছানা আশ্রয় করিয়াছিল। ইহার মধ্যে হাজ্‌রীর অসুখ বড় বেশি, গোয়াড়ি হইতে ডাক্তার দেখিতে আসিল। সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—ওগো, ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে এসো দিকি—ছেলেটাকে দেখুক—ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল। বলিল—বেজায় ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে, স্থান পরিবর্তন বা দীর্ঘকাল ঔষধসেবন দরকার। প্রথমটা হইলেই ভালো হয়।

"হাজ্‌রীর অবস্থা সুবিধার নয়। প্রতিদিন গোয়াড়ি হইতে ডাক্তার আসে।

"একদিন হরিহর সকালে উঠিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল অপূর পা একটু ফুলিয়াছে। ডাক্তার হাজ্‌রীকে দেখিতে আসিয়াছিল—হরিহর তাহাকে আবার ডাকাইল। ডাক্তার বড় মশলা খায়—মশলার কৌটা খুলিয়া একমুঠা মশলা মুখে দিয়া পা টিপিয়া দেখিয়া বলিল—হার্ট দুর্বল হওয়ার লক্ষণ—চেঞ্জ ভিন্ন এ সারবে না মশাই—না হয় কলকাতা নিয়ে যান—

"হার্ট দুর্বল হওয়ার বিপদ কি তাহা হরিহর ভালো বুঝিতে পারিল না। কিন্তু কাকের মতো চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করিলে আপদ দূর হয় না। আপদকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইবার বিধিসম্মত চেষ্টা না করিলে সে ঘাড়ে চাপিয়া বসে, গলা টিপিয়া মারেও। অজ্ঞানতা মৃত্যুর মিতা—তাহার দরবারের উকিল নয়। কাজেই আশ্বিন মাসও কাটিয়া গেলে অপূর হাতের কব্জির কাছটা ও মুখও একটু ২ (একটু একটু) ফুলিল।

"পরদিন দুপুরবেলা তেলিবাড়ির (তেলিবাড়িতে ?) কান্নার রোল উঠিল। সর্বজয়া রাঁধিতে ছিল—সে খুন্তী হাতে কাঠ হইয়া রহিল। গোয়ালা-বৌ ছুটিয়া দেখিতে যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়াবলিল—বৌ ও বৌ—কি হয়েছে রে ?...যদিও কি হইয়াচে সে ভালো করিয়াই জানে, তবুও কথাটা ভারী খাপ্‌ছাড়া ঠেকিলেও সে বিভ্রান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না। গোয়ালাবৌ ছুটিতে ছুটিতেই বলিল—আর কি হয়েচে মাঠাক্‌রুণ ! যা হবার হয়েছে...।

সর্বজয়াও গেল। পথে পেঁচোর মা ঝি বলিল—যার যেখানে মাটি কেনা আছে মাঠাক্‌রোণ—এদ্দিন তো সব কল্‌কাতা যাওয়া হয়—তো আষাঢ় মাসে সকলে বল্লে, ৭ মাস—রেলে ওঠানামার আর দরকার নেই—একেবারে আশ্বিন মাসের গোড়ায় দুটো দুঠাঁই হলে যাওয়া হবে—তা হয়ে গেল।

"হাজ্‌রী মারা যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তেলিরা বাটী চাবি দিয়া কলিকাতা রওনা হইল।

"সর্বজয়া ভয় পাইয়া স্বামীকে বলিল—ওগো এ কি জায়গায় নিয়ে এসে তুল্‌লে ! এর চেয়ে নিশ্চিন্দিপুর যে ছিল বাপের ঠাকুর !...কৈ, এত মেলেরিয়া তো সেখানে ছিল না, এ্যাদ্দিন তো ছিলাম, বর্ষাকালে মাঝে মাঝে অসুখবিসুখ হোত বটে, তাও সব্বার নয় আর এরকমও নয়—এ একেবারে কি !...হরিহরও সে কথা না বুঝিয়াছে এমন নয়। সেও তো নিশ্চিন্দিপুরে বাল্যকাল হইতেই কাটাইয়াছে—কিন্তু তাহার জলহাওয়া এত খারাপ একথা বলা যায় না। প্রথম তো বনজঙ্গল সেখানে থাকিলেও এ গ্রামে যে একেবারে দূর্বাঘাস দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ নয়। তাহা ছাড়া অত সুন্দর টলটলে নদী থাকার দরুণ এ গ্রামের যত মজা পুকুরের জল খাইয়া মরিতে হয় না, খানা ডোবাও এত নাই। আর এত মশা ?

"এই প্রথম শীতের সময় বেলা দশটার সময়ও এ গ্রামে শিশিরই শুকায় না। রৌদ্রের লেশ নাই কোথাও। বনজঙ্গলে, তেঁতুলবনে সারা গ্রামখানাকে কি করিয়াই অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। এমন একটা আর্দ্র হাওয়া বয়, গায়ে লাগিতেই মনে হয় জ্বর বুঝি আসিল ! শিশির-ভেজা বিদ্যাপতার বন দেখিলেই গা শির্‌শির্‌ করিয়া উঠে, বাতাসে কেমন একটা আর্দ্র গন্ধ—চারিধারে বনে বাগানে অন্ধকার পুকুরের জল হিম, বরফ-গলা—নাইয়া উঠিয়া মনে হয় এ শীত বোধহয় লেপ কাঁথা চাপা না দিলে যাইবে না।

"এগুলা আগে হরিহর এতটা বোঝে নাই, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

"একদিন হঠাৎ সে বাড়ি আসিয়া জানাইল ৩ দিনের জ্বরে চরণদাস বাবাজী মারা গিয়াছে।

"অপূ বসিয়া বসিয়া সারাদিন ভাবে এইবার সারিয়া উঠিলে সে বাবা ও মাকে বলিয়া সকলে মিলিয়া নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া যাইবে। এ দেশে তাহার খাপ খাইতেছে না। তাহার মুখ হাত ফুলিয়াছে মিহিলালের ভাই নিধিরাম বলিয়াছিল—এঃ, ঠাকুরমশায়ের ছেলের হাত পা ফুলেচে দেখেচো ?গুপী কবরেজ সেখানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সে বলিয়া উঠিল— হাতের ফুলো হলে ধন্বন্তরী বেটে খাওয়ালেও (একটি শব্দ পড়া যাচ্ছে না), এবার (যাবে) দেখো না ? (এখানে একটি সংস্কৃত শ্লোক, ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না) গোয়াড়ির নবকুমার ডাক্তার হল আপনার জন—আমি শালা চিরকাল আছি কিনা এখানে ?আমি কেউ নই—প্রসন্ন পরামাণিকের মেয়েটা কি মর্ত ?হেঁ হেঁ, সে এই গুপী কবরাজ সেবার অই প্রসন্ন পরামাণিককে সান্নিপাতিক থেকে আরাম করে তুলেছিল—কি মিহিলাল ?সেবার ছিল কি ওর ?ছিল কি সেবার !...তা আমি গেলাম ভেসে—গোয়াড়ি থেকে ডাক্তার এসে প্যান্টুলুন খেঁচে রবারের নল বুকে বসালে আর গালে চড় মেরে ষোলটা টাকা নিয়ে গেল চলে—আরে তুমিও যেমন ! হয়েচে ব্যাটার ছোটলোকের টাকা সেগুলো ওড়া তো চাই ?...তেমনি দর্পহারী দপ্পদূর করলেন—ফলও ফলল—বাঁচালে না গোয়াড়ির ডাক্তার ?—গুপী কোবরেজ কারুর পিত্যেশ করে না (,) বুঝলে মিহিলাল ?...এই ভাতজংলায় অনেক লোককে আস্‌তে যেতে দেখ্‌লাম—বুঝলে ?...আমি যাবো টাকা হয়েচে বলে ছোটলোকের খোসামোদ করতে ?—ব্যাটার লম্বা কথা কি ?বলে গাঁয়ে ইঁদারা কাটাবো—ইস্কুল করাবো—সবাই সব করেচে এখন পেরসন্ন পরামাণিক হলেই গাঁয়ের দুঃখ ঘোচে আর কি ?বলে—

সকল তীরথি কল্লে নাগর—

বাকি এখন গঙ্গাসাগর (।)

"সেদিন থেকেই অপূ জানে সে বাঁচিবে না। বাড়িতে কাহাকেও এ কথা বলে নাই। সজিনাতলায় রৌদ্রে শীতের বৈকালে সে বসিয়া বসিয়া ভাবে মরিলে সে কোথা(য়) যাইবে ?কি জানি কোথায় চলিয়া যাইবে—হয়তো তাহার দিদি যেখানে গিয়াছে (,) সেখানে। সে দিদির কাছে শুনিত মানুষ মরিয়া নক্ষত্র হইয়া আকাশে ফুটিয়া থাকে, সাত-ভাই-চম্পা আকাশে যেমন ফুটিয়া আছে। ঐ সব যে নক্ষত্র (,) সব অনেককাল আগেকার মরা মানুষ—ঐ নক্ষত্রটা হয়তো তার দিদি—সে মরিয়া ওরই পাশে গিয়া ফুটিয়া থাকিবে।

"আর কিছু হয় না, মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়। মায়ের জন্য বড় মন কেমন করে। চুপি চুপি বসিয়া বসিয়া কাঁদে। তাহার আজকাল লোভ ভারী বাড়িয়াছে। গোয়ালাপাড়ার ভিতরে সন্ন বুড়ির একখানা বেগুনী ফুলুরীর দোকানে আগে আগে অপূ বেগুনী কিনিত। বুড়ির ছেলেপিলে কেহ নাই, সে অপূ গেলে বলে—বোস বাবাঠাকুর—দাঁড়াও গরম গরম ভাজি—

সবদিন পয়সা নেয় না, এমনি খাওয়ায়। অপূ বসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—ও কি পাতা দিয়ে ভাজচ ?উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত—পুঁই-পাতা, জবা-পাতার বেগুনী হয়, সে কখনো শোনেও নাই। কিন্তু খাইতে মচমচে বেশ ! আজকালও লুকাইয়া সকালে গিয়া বুড়ির দোকানে বসে। বুড়ি এক খোলা ভাজিয়া নামাইলেই বলে—আমায় দেও তো একপয়সার ওই পুঁইপাতার বেগ্‌নী আর একপয়সার ওই ঝিঙে-পাতার বেগ্‌নী—পরে সে পয়সা বাহির করিয়া সাম্‌নে ধরিল (।) বুড়ি বলিল, পয়সা দিতে হবে না বাবাঠাকুর (,) বোসো—কিন্তু তোমার হাত পা ফুলেচে, জ্বর হয়—তুমি এসব তেলে-ভাজা খেও না, ছিঃ—এই একখানা ফুলুরী নিয়ে বসে খাও—আমি বেগ্‌নী বেচবো না তোমায় বাবাঠাকুর। (এখানে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় কয়েকটি শব্দ পড়া যাচ্ছে না) বাবার বকুনিতে আর বুড়ির দোকানে যাইতে পারে না। হরিহর গোয়ালাপাড়া যাইতে একদিন দেখিল অপূ বুড়ির দোকানে বসিয়া কি খাইতেছে—পাশেই বুড়ির কড়া চাপানো। তাহাকে সে টের পাই নাই নিশ্চয়ই মুখখানা পাশের দিকে ফেরানো—কারণ তাহাকে দেখিতে পাইলে কখনই নিশ্চিন্ত মনে খাইতে পারিত না। হরিহরের অত্যন্ত রাগ হইল—রাগিলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—পাজি ছেলেকে এই সেদিন বারণ করিয়া দেওয়া হইল—তা সত্ত্বেও ফের আবার—পাজি ছেলের চুলের মুঠো ধরে হিঁচড়ে আজ টেনে বাড়ি নিয়ে—

"দু চারি পা আগাইয়া নিকটে যাইতেই সে দেখিতে পাইল অপূর বাঁ হাতে ২/৩ খানা পুঁইপাতার বেগুনি, ডানহাতে একখানা লইয়া মুখে তুলিয়া খাইতেছে...

"হঠাৎ

(খসড়ার এই পাতা এখানেই শেষ। বাকি অংশ সাদা। পরের পাতা থেকে আবার শুরু করছি।)

"সে রাত্রে সে সর্বজয়াকে বলিল—দেখো—এক কাজ করবে ?চল কাশী যাওয়া যাক—

"সর্বজয়া অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কাশী ! সবশুদ্ধু ?...

"—সবশুদ্ধু নয় তো কি সব ফেলে ?

'কাশী কোথায়, কতদূর এ সম্বন্ধে সর্বজয়ার কোনো ধারণা নাই। কাশীর ওপারে গিয়া পৃথিবী বোধহয় ফুরাইয়া গিয়াছে। সে বলিল—সেখানে কি করে চলবে ?...

"—ওঃ, সেখানে বুঝি চলবার অভাব আছে ! সে অন্নপূর্ণার রাজ্যি, না খেয়ে কখনো সেখানে কেউ থাকে না—কত দানছত্র রয়েচে—কত কি...বাওন পণ্ডিতের বড় খাতির কিছু না (.) দশাশ্বমেধ ঘাটে বস্‌লেও দিন গেলে চলে যাবে—কিছু না (,) ওই চল—সবশুদ্ধ গিয়ে কাশীবাসই করা যাক—আমিও কথাটা অনেকদিন থেকে ভাবচি—বুঝলে ?আমাদের ধরো দেশেই বা কি আছে ?দেশ বিদেশ সব সমান—ছেলেটারও অসুখ সারবে এখন—

"উদ্বিগ্ন সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁগা, সেখানে এরকম ম্যালেরিয়া নেই তো ?

"—পাগল !..কিসের সঙ্গে কি—সে কি জায়গা (!) আর (একটি শব্দ অস্পষ্ট) এখনোহয়তো আমার জানাশুনো লোকই আছে—এই তো পনেরো বছর হল—দুর্গাচরণ মজুমদার বোধহয় এখনো আছেন—তা যদি থাকে (ন) তবে দেখো আমাদের লুফে নেবে (ন)—আগে কি ভালোই বাস্‌ত—(দুষ্পাঠ্য)। কাশী যাওয়া অদৃষ্টে কি ঘটিবে ?সর্বজয়ারও প্রস্তাব নিতান্ত খারাপ বলিয়া মনেহইল না। তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

"দিন পনেরো পরে গ্রামের লোক দেখিল, গরুর গাড়ি ভোরবেলা গোয়াড়ির দিকে রওনা হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল (—) ঠাকুরমশায় কলিকাতায় পরামাণিকের বাড়ি যাইতেছে। সেইদিনই বেলা ৩টার গাড়িতে হরিহর গোয়াড়ি স্টেশনে ৩ খানা কাশীর টিকিট কিনিল।

(ওপরের অনুচ্ছেদটি তিন-চারটি হাল্কা কলমের

আঁচড় দিয়ে বাতিল করা। পরেই আবার শুরু হচ্ছে—)

"দিন পনেরো পরে যাত্রার দিন স্থির হইল। এই কয়মাসে সামান্য কিছু টাকা পুঁজি হাতে হইয়াছিল। জিনিসপত্র সব বিদেশে লইয়া যাওয়া ঠিক নয়। আবশ্যকমত সামান্য কিছু লইয়া বাকিগুলি তেলিবাড়ির ঝি-এর জিম্মায় ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়া হরিহর প্রসন্ন পরামাণিককে একখানি পত্র দ্বারা সমুদয় কথা খুলিয়া লিখিল। পরে একখানি গরুর গাড়িতে সামান্য (অস্পষ্ট) ও নিজেরা উঠিয়া গোয়াড়ি স্টেশনে গেল। সেখান হইতে তিনটার গাড়িতে হরিহর তিনখানা কাশীর টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিল। কত স্বপ্ন, আশা লইয়া (অস্পষ্ট)...গাড়ি ছাড়িবার সময় সর্বজয়ার মনে একটুখানির জন্য যেন

কেমন মনে হইল—একটু কোথায় যেন নির্ভরতার অভাব। এই তো আসিল সেদিন নিশ্চিন্দিপুর হইতে—তবুও তো সে জানা জায়গায় আসিয়াছিল। এ কোথায় কোন্‌দিকে চলিয়াছে—কে জানে ?...

"কিন্তু গাড়ি ছাড়িতেই তাহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলুনিতে মনে নতুন বল আসিল। এইবার হয়তো—কে জানে—বরাত খুলিতে কতক্ষণ ?...

"একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি Level crossing-এর কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ি চলিয়া যাইবার অপেক্ষা করিতেছিল।

"গাড়িতে আর কেহ ছিল না।

"সর্বজায়া হাসিমুখে অনুযোগের সুরে স্বামীকে বলিল—এতদিন এখানে থাকা হল— একবার গোয়াড়ি শহরটা কিরকম দেখালে না ?...

"আনন্দে তাহার মন আবার ভরিয়া উঠিয়াছিল।"...

[বিভূতিভূষণের খসড়া এই পর্যন্ত উদ্ধৃত করা গেল। এর পরে আর একটানা পাণ্ডুলিপি কিছু নেই—বিচ্ছিন্ন নোটের মতো রচনা রয়েছে। সেগুলি যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেককারী হলেও এখানে খাপ খাবে না। তা নিয়ে পৃথক সন্দর্ভ রচনা করা যেতে পারে।

উপরে যে পাণ্ডুলিপির অংশ মুদ্রিত হল তাতে কয়েকটি অভিনব প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, প্রচলিত 'পথের পাঁচালী'-তে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী যায়, সেখানে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং বর্ধমানে কিছুদিন থাকার পর সর্বজয়া ও অপু মনসাপোতা আসে।

এই বাতিল খসড়ায় হরিহর নিশিন্দিপুর থেকে প্রথমে মনসাপোতা এবং পরে কাশী যায়। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে বিভূতিভূষণের পরিকল্পনা প্রচলিত সংস্করণের কাহিনীর ঠিক উলটো ছিল।

প্রচলিত 'পথের পাঁচালী'-তে মনসাপোতা বা তেলিবাড়ির কোনো উল্লেখ নেই, আছে 'অপরাজিত'-তে। সে বিবরণও বিশেষ দীর্ঘ নয়। কিন্তু এই বাতিল খসড়ায় বিভূতিভূষণ মনসাপোতায় প্রাথমিক বসবাসের সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। অপু ম্যালেরিয়ায় ভুগে কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। সর্বজয়া স্বামীকে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে, কারণ তার মতে সেখানকার জলহাওয়া তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাস্থ্যকর। সর্বজয়া-এর উক্তি আমাদের বিস্মিত করে, কারণ নিশ্চিন্দিপুরেই দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগে দুর্গার মৃত্যু হয়েছিল।

গুপী কবিরাজের পেশাগত ঈর্ষার বর্ণনাও মানবচরিত্রের একটি নিখুঁত বিশ্লেষণ। দীর্ঘ রোগভোগে বিপর্যস্ত বালক অপূকে দেখে তার হৃদয়হীন মন্তব্য সঙ্কীর্ণমনা গ্রাম্য ভিষগের মানসিকতাকে পরিস্ফুট করে।

স্বর্ণবুড়ির দোকানে তেলেভাজা খাওয়ার ঘটনা বিভূতিভূষণ পরে 'অপরাজিত'-তে কাজলের চরিত্রে জুড়ে দিয়েছেন।]

|| ৩||

দুর্গাহীন 'পথের পাঁচালী'

[পাণ্ডুলিপির এই অংশটি বর্তমানে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে।

প্রচলিত 'পথের পাঁচালী'-র সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও বেশির ভাগটাই এই খসড়ার সঙ্গে মেলে না। হরিহরের বাড়িতে রাত্রে অতিথি আসা ইত্যাদি প্রসঙ্গ পরবর্তীকালে 'দুর্মতি' ছোটগল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্তমান খসড়ায় হরিহরের চরিত্র বৈষয়িক এবং বেশ খানিকটা কুটিলরূপে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত 'পথের পাঁচালী' মারফত হরিহরকে আমরা চিনি উদার, কবিত্বময়, স্বপ্নদর্শী একজন সরল মানুষ হিসেবে। দ্বিতীয় সত্তাটি বিভূতিভূষণের কাছেও বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় এই খসড়ায় হরিহরকে তিনি বাতিল করেছেন।

দুষ্পাঠ্যতা, পাতা হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে পাণ্ডুলিপির এই অংশ খণ্ডিত, সর্বত্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এর গুরুত্ব পাঠের আনন্দে নয়, বাংলা সাহিত্যের মহান এক উপন্যাসের সম্ভাব্য দ্বিতীয় সত্তার আশ্চর্য উন্মোচনে।]

॥১॥

‘নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রান্তে হরিহর রায়ের ছোট একখানা কোঠাবাড়ি ছিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে তার স্ত্রী ও এক ছেলে। হরিহর রায়ের বয়স ছিল বছর পঁয়ত্রিশ, গাঁয়ের মানুষ, কাজেই কোথাও না গিয়া সে বাড়ি থেকেই সামান্য জমিজমার খাজনা পাইত [?]। বাড়ির পিছনের একটুখানি জমিতে কচু, কুমড়ার আবাদ করিত, ইহাতে তিন প্রাণীর একপ্রকার কষ্টেসৃষ্টে চলিত।’

কার্তিক মাসের শেষ হইলেও খুব শীত পড়িয়াছে। সন্ধার সময়ে এক দূর গ্রামের প্রজাবাড়ি হইতে খাজনা সাধিয়া হরিহর বাটী ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী সর্বজয়া তুলসীতলা [য়] সন্ধা দেখাইতেছিল, স্বামীকে দেখিয়া তুলসীতলায় [?]প্রণাম সারিয়া কাছে আসিয়া বলিল, “তবে যে বলা হল ফিরতে অনেক রাত হবে, আমি এখনো ডাল রাঁধিনি।” হরিহর হাতের পুঁটুলী নামাইতে নামাইতে [বলিল] “এলাম চলে, কেউ এক পয়সা তো দেবে না শালারা, মিথ্যে মিথ্যে হয়রান হওয়া।” সর্বজয়া হাতের প্রদীপ নামাইয়া বলিল, “একটু দাঁড়াও আমি কুয়ো থেকে টাটকা জল তুলে দি। তবুও একটু গরম হবে এখন। এবার যে শীত পড়ল, তাতে পুকুরের জলে আর কাজ চলবে না।”

হরিহরের ছেলে অপূ মাকে নিশ্চিন্তমনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে [তক্তা] পোষের উপর দাঁড়াইয়া তাকের হাঁড়িকল্সীখুট্খাট্ করিয়া বোধ হয় কিসের সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। বাবার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিল বিপক্ষ সজাগ হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরেরদাওয়ায় আসিয়া বাবার বড় পুঁটুলিটা দেখিয়া অসাফল্যের দুঃখ ভুলিয়া গেল। বাবাকে সে ভয় করিত। হঠাৎ কাছে না আসিয়া আঙুল দিয়া পুঁটুলিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি বাবা ওতে ?” হরিহর বলিল, “হ্যাঁরে এই বাঁদর, এই শীতে একটু কিছু গায়ে দিতে নেই তোর ?ওগো অপুর সে দোলাইখানা কোথায় গেল ?” সর্বজয়া জলের বালতী নামাইতে নামাইতে বলিল—“[?]নাকি ?বিকেল থেকে বকচি, ওকি কথা গ্রাহ্য করে নাকি ?ওই তো কাঠের আলনায় দোলাই রয়েচে, জামা রয়েচে, সবই রয়েচে—”

হরিহর বলিল—হুঁ সে বেতখানা গেল কোথায় ?

অপু প্রমাদ গণিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল, “আচ্ছা আজ থাক গো, ফের. এবার [?]কিন্তু যেদিন ?আলগা গায়ে বেড়াচ্চো, সেদিন মজা দেখবে এখন—”

একঘণ্টা পরে দেখা গেল সর্বজয়া রান্নাঘরে বসিয়া একরাশি কলায়ের ডাল বাটিতেছে। বাহিরের কনকনে শীত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হরিহর উনুনের পাড়ে বসিয়া তামাক খাইতেছে এবং স্ত্রীর সহিত খোসগল্প করিয়া সমস্ত দিনের শ্রম বিনোদনের চেষ্টা করিতেছে। অপু দোলাই গায়ে দিয়া শান্তভাবে মায়ের কাছে বসিয়া আছে।

হরিহর ভালো করিয়া এক কল্কে তামাক সাজিয়া টান দিতে দিতে কহিল, “অত তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই—সবে তো সন্ধে [?] [।] আজ দেখে এলাম রায়েদের মাঠের বাগানে, সব তাঁবু ফেলেচে, সেটেলমেন্টের বড় সায়েব নাকি আসবে, দুটো গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে জিনিসপত্র সব এল—”

সর্বজয়া মাথা ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল—পোড়া সেটেলমেন্টো আর কতদিন ধরে হবে ?ওর খরচা দিতেই তো এবার—

হরিহরের সামান্য যা কিছু জমিজমা ছিল এবার তাহার খরচ বাবদ গবর্নমেন্টকে তাহার ১১ টাকা ৭ আনা দিতে হইয়াছে। সে কিন্তু স্ত্রীর কাছে ও যেসব নিরীহ লোকে জমিজমার ধার ধারে না, তাহাদের কাছে প্রচার করিয়া বেড়াইত যে তাহার পৈতৃক অনেক জমি পূর্বে লোকে ফাঁকি দিয়া খাইত, এখন সেটলমেন্টে সেগুলি সে ফেরত পাইয়াছে, অনেক টাকা এজন্য তাহাকে খরচা দিতে হইয়াছে, সেটলমেন্টের ক্যাম্পে তাহার খুব খাতির ইত্যাদি।

স্ত্রীর চোখে বড় হইতে সবাই চায়, হরিহর স্ত্রীর মুখে সেটলমেন্টের কথা শুনিয়া আরম্ভ করিল—“দ্যাখ সেদিন তো ক্যাম্পে গেলাম। আমাদের গাঁয়ের অনেক সব বড় বড় (হরিহর আঙুল দিয়া ইঙ্গিতে দেখাইল) হুঁ হু—ডেকে জিগ্যেসাও করলে না কানুনগো। আমি যেতে মাত্রই কানুনগো একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বল্লে, জমিদার মশায় আসুন, সাতবেড়ের দরুন সেই যে কাগজপত্র গোলমাল হয়েছিল, এই ও বাটি নাড়িস্ নে, দোলাই ধরে উঠবে সরে বস আরো সরে যা, তারপর সেই গোলমালের কথা বলতেই কানুনগো মহুরিদের সব বকে উঠল, বল্লে “রায় মশায় আমি যেটা নিজে না দেখবো, সেইটেই গোলমাল হয়ে যাবে, আপনি বসুন আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। সে খাতির কী—”

হরিহর বারকয়েক জোরে জোরে তামাক টানিয়া অধিকতর ভিত্তিহীন কি একটা ফাঁদিতে যাইতেছিল। এমন সময় তাহাদের বাহির বাড়ির সদর দরজায় কে যেন ঘা দিতেছে শোনা গেল। সর্বজয়া ডালবাটা বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া শুনিয়া বলিল, "ওগো বাইরের দরজায় কে যেন ঘা দেয় ?"

হরিহর বলিল, "কৈ না কে ঘা দেবে ?"

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আঘাতের শব্দ ও কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সর্বজয়া বলিল, "ঐ যে কে ডাকচে, দেখো না একবার।"

হরিহর শঙ্কিত হইল। সে পূর্বেও আঘাতের শব্দ না শুনিয়াছে এমন নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু প্রত্নতত্ত্ব নিহিত আছে, অদ্য তিন বৎসর পূর্বে ঠিক এই পৌষ মাসেই রামনারায়ণপুরের হাটেএক কাবুলী আলোয়ান বিক্রেতার নিকট সে ধারে ১০ টাকা মূল্যের এক আলোয়ান খরিদ করিয়াছিল। হতভাগ্য কাবুলিওয়ালা দুই বৎসর যাবৎ বহু হাঁটাহাঁটি করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, হরিহরের সাক্ষাৎ পর্যন্ত পায় নাই। মধ্যে সে ৪৫ দিন পূর্বে আসিয়াছিল এবং হরিহরের দেখা না পাইয়া যাইবার সময় গ্রামের নিকট শাসাইয়া গিয়াছে যে এবার যেদিন আসিবে আর একা আসিবে না। দেখিবে যে টাকা আদায় হয় কি না হয়। কাবুলিওয়ালা চলিয়া যাইবার পর গ্রামের লোচন ঘোষ চুপিচুপি আসিয়া হরিহরকে সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে। এসব কথা সর্বজয়া জানিত না। হরিহর শঙ্কিত চিত্তে বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কাবুলিটা এত রাত্রে আসে নাই তো ?বিচিত্র কি ?সঙ্গে কি সে দুএকজন দেশভ্রাতাকে আনিয়াছে ?—তাহা হইলে উপায় ?

সন্তর্পণে পদদ্বয় শূন্যে তুলিয়া এবং শুদ্ধুমাত্র বৃদ্ধ পদাঙ্গুলিদ্বয়ের উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে হরিহর শুনিতে পাইল দরজার বাহির হইতে পরিষ্কার বাংলায় কে বলিতেছে, "বাড়িতে কে আছেন ?একবার দোরটা খুলুন।"

যাক—বাঁচা গেল। তাহা হইলে কাবুলিওয়ালাটা নয়।

হরিহর বাহির দরজার খিল খুলিয়া দিল। দেখিল বাহিরে একজন অপরিচিত ভদ্রবেশী প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া, গায়ে শাল, মাথায় কালো কম্ফর্টার, হাতে একগাছা বেতের লাঠি, অন্যহাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটাই হরিহর রায় মহাশয়ের বাড়ি তো ?হরিহর বলিল, আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম।

প্রৌঢ় বলিলেন—ওঃ, বেশ। বড় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আসচি গিয়ে কলকাতা থেকে—আমার নাম কৃষ্ণধন গাঙ্গুলী—এই ট্রেনেই আসচি। তোমার শ্বশুর রামজীবন বাবুর সঙ্গে একসময়ে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল—তাঁর ওখানে যথেষ্ট যাতায়াত ছিল আমার। তবে—এখন, বাইরে বাইরে থাকি এইজন্যে ততটা আর—বেশ বেশ বড় সন্তুষ্ট হলাম বাবাজীকে দেখে।

হরিহর বলিল—"আজ্ঞে তা আসুন বাড়ির মধ্যে।

মুখে অভ্যর্থনা করিলেও হরিহর মনে মনে মহা চটিয়া গেল। দিব্যি শীতের রাত্রে স্ত্রীর সহিত গল্প জমাইয়া আনিয়াছিল—এখন আবার নিয়ে এস জলখাবার—করো বিছানার জোগাড়—কোথায়ই তো ?আর কোথায়ই বা কি ?—শ্বশুরগিরি ফলাবার আর সময় পেলেন না। এইসব দুর্বৃত্তদের জন্যে আর দুনিয়ার সুখশান্তি নাই ?

কৃষ্ণলালবাবু [?]বলিতে ২ চলিলেন—তোমাদের এই বাড়িতেই একবার এসেছিলুম বাবাজী সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। তোমরা তখন সব ছেলেমানুষ। তোমার জেঠামশায় নীলমণি রায় মশায়ও ছিলেন আমার বন্ধু—একসঙ্গেই সাহেবের কাজ কর্তুম। সেই সময় তার ছেলে নরুর পৈতে হয়, সেই উপলক্ষেই আসা।...আহা নিলুও অল্পবয়সে মারা গেল। তা নৈলে তো কতবার আসতুম যেতুম। বিনু ওরফে বীণাপাণি হরিহরের প্রথমা পত্নী। সে কয়েক বৎসর পূর্বে মারা যাওয়ায় হরিহর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, সেই স্ত্রীই সর্বজয়া।

হরিহর বলিল—হ্যাঁ নরেনদার ছেলেপিলেরা এখন কোথায় আছে ?

হরিহর দালানের সামনে রকে উঠিল। কৃষ্ণবাবু রকে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, সেইজন্যেই তোআসা বাবাজী। চলো সব বলছি খুলে। ওঃ এ দালানের দরজাটা বড় নীচু—সেকেলে বাড়ি কিনা। তখন এইরকমই ছিল।

হরিহর বলিল—বসুন এই চৌকীতে। জুতোটুতো খুলুন, জল আনিয়ে দি—হ্যাঁ নরেনদার কথা কি বলছিলেন ?এক অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় হরিহরের বুক দুরদুর করিয়া উঠিল।

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—সে অনেক কথা। বলবো এখনবাবাজী এর পর। এখন—

হরিহর বলিল—আপনি বসুন—আমি আসচি, জামাটা খুলুন ততক্ষণ।

কৃষ্ণবাবু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—ঘরদোরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বহুপুরোনো বাড়ি, একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেতে গন্ধ উঠিতেছে। দরজা জানালায় কাঠ ক্ষয়িয়া বড় বড় ফাঁকের সৃষ্টি করিয়াছে ও সামনের জানালাটির কবাট ঝুলিয়া পড়ায় নারিকেল কাতার দড়ি দিয়া উহা গরাদের সহিত বাঁধা। বাহির হইতে হু হু হিম ঢুকিতেছে। বাহিরের রকের ফাটলে কি সব গাছ গজিয়াছে। বন্ধুর কন্যাটি যে এরূপ দরিদ্রগৃহে পড়িয়াছিল ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। মৃত বন্ধুকন্যার কথা মনে হইতেই কৃষ্ণলালের বড় কষ্ট হইল। এইসময় হরিহর প্রবেশ করিলে কৃষ্ণবাবু বলিলেন—আমার জন্যে বাবাজী তোমায় কিছু ব্যস্ত হতে হবে না—আমি রাত্রে একরকম কিছুই খাইনে—বয়স তো হল কম না—রাতে খাওয়া আর সয় না তা—নৈশ আহার না করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হরিহর সময়োচিত একটা ভদ্রতার কথা বলিল।

॥২॥

ঘণ্টা দুই পরে আহারাদি শেষ করিয়া শুইবার আগে তামাক খাইতে ২ কৃষ্ণবাবু বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ বাবু কথাটা আগে বলে নি। তোমার জেঠামশায়ের ছেলে নরু তো—ছোকরাঅল্প ?ছিল—আমরা কেবল রয়ে গেলাম—সে খবর পেয়েছিলে তো ?"

হরিহর কৃত্রিম দুঃখের ভান করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—বলিল—"হ্যাঁ, তো সবই অদৃষ্ট ! তাই যদি না হবে তাহলে আর—" হরিহর শোকের বাক্যটা বেশি বড় না হইতে দিয়া সংক্ষেপে শেষ করিয়া ফেলিল কারণ 'কাজের কথাটা' কি তাহা শুনিবার জন্য তাহার মনপ্রাণ উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণবাবু বলিলেন—সেও তো হয়ে গেল আজ ২/৩ বৎসরের কথা। নরুর পরিবার ও ছেলেমেয়ে এতদিন লাহোরেই ছিল—টাকাকড়ি যা ছিল তা থেকে ছেলেটির লেখাপড়া চলছিল—ছেলেটি বড় ভালো, বেশ বুদ্ধিমান, পড়াশুনোতেও বেশ, গত বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচে—তারপর ধরো বিদেশেও খরচপত্র বেশি, তাছাড়া অভিভাবকহীন, এক আমি ছিলাম তা আমি এই সামনের বছরই চাকরি ছেড়ে দোব, আর এ বয়সে পোষায় না। তাই ভাবলাম ওরা এসে দেশের বাড়িতেই থাকুক—টাকাকড়ি হাতে এমন কিছুই নেই—মেয়েটারও বিয়ে আছে। সেইজন্যেই আমার আসা। ওদের নিয়ে আমার ছেলে আসতে পারবে এখন, সে বন্দোবস্ত আমি করে দেব। আমি কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাব—তারপর একটা ভালো দিনটিন দেখে—তবে দেশে ঘরে আসবে এর আর দিনই বা কি ?যাই হোক—এই গেল ব্যাপার—তা তুমি যখন আছো, তখন আর ভাবনা কিসের ?তাদের আপনার জনের কাছে এলে এ সময় বুঝলে না ?তা যাও বাবাজী রাত হয়ে গেল—শোও গে, কাল সকালে কথাবার্তা হবে এখন। শুইবে কি হরিহরের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কিছু যে একটা বে-গতিক ঘটিবে, সে ইহা পূর্ব হইতেই ভাবিয়াছিল, কিন্তু সে বিপদ যে এরূপ আসন্ন, তাহার প্রকৃতি যে এরূপ সঙ্গীন, তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

হরিহরের জেঠামশায় নীলমণি রায় মহাশয় বিদেশে কমিশারিয়েটে চাকরি করিতেন, এতদুপলক্ষে তিনি বিদেশেই থাকিতেন। দেশে কালেভদ্রে ক্বচিৎ কখনো আসিতেন মাত্র। তিনি হরিহরের পিতার সহিত একান্নবর্তী ছিলেন না, এবং পৃথক হইয়া পৈতৃক বাটীর এক অংশে তিনি কয়েকটি নূতন কুঠুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি অর্থবান ও যথেষ্ট উপার্জন করিতেন, এরূপ খ্যাতি ছিল। মাঝে মাঝে তিনি হরিহরের পিতাকে অর্থসাহায্যও করিতেন কারণ হরিহরের সংসার কোনো কালেই সচ্ছল ছিল না। নীলমণি রায় মারা যাইবার পর তাহার পুত্র নরেন্দ্র পিতার অফিসেই কার্যপ্রাপ্ত হয় এবং পিতার মতোই উপার্জন করিতে থাকে। সেও দেশে বড় আসিত না, একবার ১৫/১৬ বৎসর পূর্বে আসিয়া নিজ অংশের ঘরগুলি মেরামত করাইয়া ও চুণকাম করাইয়া যায়। তাহার পর ২/৩ বৎসর পূর্বে নরেন্দ্র লাহোরেই প্লেগে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে এ সংবাদও হরিহরপাইয়াছিল। তাহারই পরিবার ও ছেলেমেয়ে আজ বাটী আসিতে চাহিতেছে। সর্বনাশ !...আসল কথাটি হইতেছে এই যে এতদিন নির্বিবাদে সে উভয় অংশের জমিজমার খাজানা আদায় ও বাগানের আম-বাঁশ বিক্রয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং জেঠামশায়ের অংশের ঘরগুলি অধিকার করিয়া আসিতেছে। বর্ষাকালে কাঠঘুঁটে রাখিবার অসুবিধা নিবন্ধন সে জেঠামশায়ের উত্তরের কুঠুরীতে সঞ্চিত বাঁশকাঠ রাখে, গত বৎসর পালিত পাড়ায় সস্তাদরে কিছু পুরনো কড়ি, বরগা কিনিয়া তাহা সে উহাদের অন্য একটা কুঠুরীতে রাখিয়াচে, বাকি দুইটি কুঠুরী সে নিজেদের শয়নঘর

হিসাবে ব্যবহার করে, কারণ তাহার নিজের পৈতৃক অংশের কুঠুরীগুলি বহুদিন বে-মেরামতী অবস্থায় থাকিবার দরুন বাসের প্রায় অযোগ্য।

হরিহর বাহিরের রকে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে পড়িল, ছেলেবেলায় গুরুমশায়ের বিদ্যা আজ একেবারে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে হতভাগ্য হরিহরের চক্ষের সম্মুখে দেখা দিবে, ইহা কে জানিত ?আরো কথা আছে।

সে ভাবিতে লাগিল—আসিল আসিল তা আবার এই জরীপের সময়ই আসিল ?ইতিপূর্বে সে ইহার [?]অংশের কিছু কিছু জমি নিজের বলিয়া কাগজপত্র লিখাইয়াছে, আর কিছুদিন পরে সমস্ত জমিই এইরূপ লিখাইয়া লইত। কে জানিত নরেনদার নাবালক পুত্র ও বিধবা স্ত্রী হঠাৎ এরূপভাবে উপস্থিত হইয়া সব দিক মাটি করিবে ?এর চেয়ে সে কাবুলীওয়ালাটা আসিলেও যে তাহা সহস্রগুণে ভালো ছিল।

পরদিন দুপুরবেলা আহারাদি করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে যাইবার জন্য কৃষ্ণবাবু গরুর গাড়িতে চড়িলেন। স্টেশন গ্রাম হইতে ৫/৬ মাইল দূরে, সন্ধ্যার পর গাড়ির সময় হইলেও অগ্রে না বাহির হইলে পাছে ঠিক সময়ে না পৌঁছিতে পারা যায়, এজন্য কৃষ্ণবাবু সকাল করিয়াই যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে একখানি দশ টাকার নোট হরিহরের হাতে দিয়া বলিলেন, "বাবাজী আমার চিঠি পেয়ে তুমি ঘর-দোরগুলো পরিষ্কার করে রেখো, তাছাড়া একটা ঝি-টি ঠিক করে রেখো, তা নৈলে তাদের বড় কষ্ট হবে—হাট বাজার করে রাখবার দরকার বিবেচনা কর্লে তাও করে রেখো, তোমাকে বেশি আর কি বলবো..."।

কৃষ্ণবাবু চলিয়া যাইবার দিন কুড়ি বাইশ পরে হরিহর তাঁহার নিকট হইতে এক পত্র পাইল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মেয়েছেলেদিগকে লইয়া বৃহস্পতিবারের ভোরের ট্রেনে নবাবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিবে, দুইখানি গোরুর গাড়ি যেন সে ঐ সময়ে স্টেশনে রাখে। কথিত দিনের পূর্বদিন হরিহর নিজে ও তাহার স্ত্রী সর্বজয়া দুইজনে মিলিয়া উত্তরের কুঠুরী হইতে কাঠ ঘুঁটে বাহির করিয়া উঠানে ফেলিয়া ঘরখানা একপ্রকার পরিষ্কার করিয়া রাখিল। অন্য ঘরখানির রাশীকৃত কড়ি বরগা স্থানান্তরিত করা তাহাদের নিজেদের সাধ্যাতীত বোধ হওয়াতে তাহা উহারা সে ঘরেই রাখিয়া দিল। ঘর পরিষ্কার করিতে ও কাঠকুটা সরাইতে উভয়ের বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। ধূলিধূসরিত বস্ত্রে ও ঊর্ণনাভ স্তম্ভখচিত কেশে সর্বজয়া বকিতে বকিতে স্নান করিতে যাইতেছিল—"মা রে মা, এত শতেক্ষোয়ারিও অদৃষ্টে লেখা ছিল। একবাড়ির [?]খ্যামতেই নেই যদি, তবে বিয়ে কর্তে না গেলেই তো ছিল ভালো। ছেলেটা সেই কোন্ সকালে দুটো পান্তো ভাত খেয়ে আছে, কখন নাইবো, কখন বা বাছাকে দুটো ভাত দেব, হাড় একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেল।"

হরিহর পূর্ব হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল—মাঝে মাঝে কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ রাখিত। অদ্য খাটা-খাটুনি বা অনিয়ম হওয়াতেই হোক বা কি জানি অন্য কি কারণেই হোক, সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পূর্বে হরিহরের ধমক দিয়া জ্বর আসিল। সে তক্তাপোষের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—সর্বজয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিরকম আছ ?"—তারপর সে লেপ একটুখানি উঠাইয়া কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া হাত রাখিয়া বলিল, "ওঃ গা একেবারে পুড়ে যাচ্চে, কি খাবে এখন রাত্রে ?" হরিহর বিকৃত স্বরে বলিল—"ছাই খাবো। উঁহু লেপ তুলো না, থাক। ঐ গিয়ে একটুখানি খাবার জল ঐ বড় ঘটিটা করে আমায় দিয়ে যাও দিকি ?ও বাবা, গেলাম রে বাবা..."

অনেক রাত্রে হরিহর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গরম গরম দুইটি ভাত, ওবেলাকার বাসি কলায়ের ডাল ও অন্য কি উপকরণ সংযোগে আহার করিতেছিল কারণ তাহার কম্প তখন চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকাল ৯।।০ সময় দুইখানি গোরুর গাড়ি হরিহরের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। হরিহর স্টেশনে গাড়িদুইখানি পাঠাইয়া দিয়াছিল—ভোর ৬টায় গাড়ি আসে, অনেক দূর পথ আসিতে বেলা হইয়া গিয়াছে। একজন হৃষ্টপুষ্ট ২৭/২৮ বৎসরের শ্যামবর্ণ যুবক, আগে গাড়ি হইতে নামিল ও হাত ধরিয়া একটি ৯/১০ বৎসরের মেয়ে ও ১১/১২ বৎসরের ছেলেকে গাড়ি হইতে নামাইল। ছেলেটিকে নামাইতে হইল না, যুবক হাত ধরিতেই সে ছৈ-এর মধ্য হইতে এক লাফ দিয়া মাটিতে নামিয়া পড়িল। ছেলে মেয়ে দুটিই অতি সুন্দর দেখিতে, পশ্চিমদেশসুলভ নিটোল স্বাস্থ্য তাহাদের প্রবর্ধমান শিশু-শরীর সুকুমার লাবণ্যে ভূষিত করিয়াছে। সকলের শেষে একটি বিধবা ছৈ-এর মধ্য হইতে নামিলেন। জিনিসপত্র গাড়ি হইতে নামানো হইল। ৪টা ট্রাঙ্ক ৪/৫টি বড় বড় পোঁট্লা—৪/৫ থলে বাসন কোসন। ?নামানো হইলে গাড়োয়ান ভাড়া চাইলে হরিহর যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিল—ভাড়াটা আমার কাছে—ঐ সব গোছাতে গোছাতেই দশ টাকা খরচ

হয়ে গেল কিনা। ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া, ধূলো ঝাড়া, কতদিনের কথা, সে তো একটা আধটা দুপুরেই [?]কর্ম নয়, তা ছাড়া এখানে মজুরির দরও বেশি কিনা—"

যুবকটি কৃষ্ণবাবুর পুত্র। সে পিতার নিকট শুনিয়াছিল, গাড়িভাড়া ইত্যাদি বাবদ টাকা হরিহরের নিকট দেওয়া আছে, তথাপি সে দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্যাগ খুলিয়া ভাড়া মিটাইয়া দিতেছে। ছোট ছেলেটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ঐ যা নরুদা, সেই বইখানা কোথায় ফেল্লেন ? ?পুর থেকে কিনলেন যে।"

তাড়াতাড়ি দুই পকেট হাতড়াইয়া বলিল—"যাঃ গিয়েছে সুনু, (ছেলেটির নাম সুনীল) [।]"

"শেয়ালদ থেকে হয়েও তো পড়ছিলাম, তা হলে গাড়িতেই গিয়েচে।" ছেলেটি বলিল "দেখলেন ?গাড়ি থেকে নামবার সময় দেখে নিলেন না কি ফেললেন ?গেল একটা টাকা।" ১০/১১ বৎসরের ছোট্ট মেয়েটি খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"রানাঘাট স্টেশনে আমার হাতে কি দিলেন নরুদা ?" পরে সে উঠানে নামানো একটা চাবিবিহীন বেতের ঝাঁপির ঢাকা [?]তাড়াতাড়ি খুলিয়া একখানা মোড়কে—ছবি আঁকা বই তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"এখানা কি ?নরুদা [?]আপনি তো বেশ। আচ্ছা যদি টাকা হোত ?"

নরেশ মেয়েটির হাত হইতে খপ করিয়া কাড়িয়া লইল। বলিল—"যাঃ জ্যাঠামি করিস নে, টাকা [?]তো নয়। টাকা হোলে এরকম ভুল হোত না জেনে রাখিস।"

+++হরিহরের ছেলে অপু রকে দাঁড়াইয়া নব-আগন্তুকদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। ইহাদের কাপড়, বিশেষ করিয়া কথা কহিবার ধরণ, তাহার কাছে কেমন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঠেকিল। ইহাও তাহার মনে হইল সে এ পর্যন্ত এই ধরণের কথা (শোনে নাই)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'নিশ্চিন্তপুর গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থ মাঠে জরিপের তাঁবু পড়িয়াছে। এই মাঠকে এই অঞ্চলে কুঠীর মাঠ বলে। এই মাঠের ?নবগঙ্গা নদীর ধারে সেকালে বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসারনের নীলকুঠী ছিল—এখানকার কুঠী এদিককার ১৪টার হেডকুঠী ছিল। উলুখড়ের বনের পিছনে, নদীর ধারে, অধুনালুপ্ত, হিংস্র, বিরাটকায় প্রাগৈতিহাসিক জীবদেহের কঙ্কালস্বরূপ সেই প্রাচীন নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ অনেক দূর জুড়িয়া পড়িয়া আছে। জ্বাল-ঘর, হাউজ-ঘর, চাপ-ঘর, বাংলা-ঘর এবং তাছাড়া আরো অনেক ছোট বড় বড় নদীর ধারে ধারে বা মাঠের মধ্যে বাবুলকাঁটার বনে বা বুনো কুল ঝোপের মধ্যে ছাদ-ভাঙ্গা অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, তাদের ভাঙ্গা দেউলের ফাটলে ফাটলে জীউলি-অশ্বত্থের বড় বড় গাছ গজাইয়াছে, তাদের মেজেতে ঘন রক্তকুঁচের দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল ঠেলিয়া—প্রবেশ করে এমন সাধ্য শিয়ালকুকুরেরও নাই। অথচ ?৬০/৭০ বৎসর পূর্বে এ-সব স্থানে ঘাড় সোজা করিয়া হাঁটে এমন অসমসাহসী পুরুষ বড় দেখা যাইত না—কারণ তখন এখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কুটিয়াল জন্ লার্‌মার্‌ রাজত্ব করিত। এ অঞ্চলের অত্যন্ত বৃদ্ধ এক-আধজন লোকে এখনো সে-সব দিনের গল্প করিতে পারে—কিরূপে ?সাহেব বিদ্রোহী প্রজাশাসন করিবার জন্য ?গাঁ ও মাধবপুর এই দুই গ্রাম একরাত্রে জ্বালাইয়া দিয়াছিল, কি করিয়া নিশ্চিন্তপুরের মহামাননীয় মজুমদার বাটীর হরমজুমদারকে কুঠীতে লইয়া যাওয়ায় গ্রামে গ্রামে হুলুস্থুল বাঁধিয়া গিয়াছিল এবং কিরূপে প্রায় দুই মাস মোল্লাহাটির কুঠীর চূণের দাগ ? ?"

কুঠীর এক গোপন কোণ হইতে কুঠী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ২০/২২ বৎসর পরে, রাশীকৃত মানুষের কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়ে, কিরূপে এক গ্রামের মোড়লকে শাস্তি বিধান করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দেহের একাংশ একটি অবনমিত বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া অপরাংশ অন্য একটি উক্তরূপ বৃক্ষশাখায় বাঁধা হয় এবং সকল লোকের চোখের উপর হতভাগ্য প্রজার দেহ দুইভাগে ছিন্ন করিয়া দু'দিকের বৃক্ষশাখা দুটি সশব্দে ও সতেজে পূর্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি গল্প এখনো এ অঞ্চলের এক আধজন বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

নিশ্চিন্তপুর হইতে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বাঁধা সড়ক লারমার সাহেবই বাঁধাইয়া দেয়, যখন এই পথে লারমার টমটম হাঁকাইয়া যাইত, দূর হইতে সাহেবকে আসিতে দেখিয়া প্রজাবর্গ [?]তাড়াতাড়ি সড়ক ছাড়িয়া দিয়া পার্শ্ববর্তী মাঠে নামিয়া পড়িত—হিংস্র জন্তুকে লোকে যেমন দূরে করিয়া চলিতে চায়, তেমনি পারতপক্ষে কেহ সাহেবের ত্রিসীমানায় কোনোদিন ইচ্ছা করিয়া ঘেঁষিতে চাহিত না। লারমার সাহেব দেখিতে অত্যন্ত দীর্ঘকায়, অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, মুখ অত্যন্ত লাল, ঘাড় খাটো, রাগিলে স্থূল ও খাটো, লাল রঙের গলার মধ্য হইতে ক্রুদ্ধ বৃষের মতো কর্কশ ও গম্ভীর নিনাদ বাহির

হইত। লারমার সাহেব ভয় কাহাকে বলে কখনো জানিত না, তাহার কর্মপটুত্বও ছিল অদ্ভুত রকমের। ১৫৭৭ [?]সালের নীলবিদ্রোহের সময় যখন সব কুঠীর নীলের দাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন এক নিশ্চিন্তপুরের কুঠীতেই কেবল পুরা মরসুমে নীল কাটা [?]ও থিতানো চলিতেছিল ? ?লারমার সাহেবের মতো আকৃতিবিশিষ্ট লোককে অস্ট্রেলিয়ার জনহীন দিক্‌দিগন্তহীন মরুভূমিতে সুবর্ণান্বেষী ধনানুসন্ধিৎসু রূপে বা দক্ষিণ আফ্রিকার [১] কোন সিংহস্থল, সীমাহীন বিজন মরুপ্রান্তস্থ কোনো কৃষিক্ষেত্রের কর্তারূপে মানাইতে পারিত—কিন্তু বাংলাদেশের নিতান্ত নিরীহ গ্রাম্যনদী ?পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র পল্লীটির মাঠে ভাঁট, বাবলা, কদম, শিমুল ফুলের মধ্যে জন লারমারকে সম্পূর্ণ বেখাপ ঠেকিত নিশ্চয়।

জন লারমারের নিজ বাংলোর এখন আর কিছুই নাই—ইঁটকাঠের স্তূপ হইয়া বহুদিন জঙ্গলাবৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল [।] পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা ২/১ গাড়ি করিয়া ইঁট লইয়া তাহাকে বহুদিন হইল নিঃশেষ করিয়াছে। জন লারমারের পূর্ব পত্নীর সমাধি অনেকখানি অবধি বর্তমান ছিল, বহু বৎসর হইল তাহাও নদীগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে, বর্তমানে নদীর ধারে লারমার সাহেবের শিশুপুত্রের সমাধিটি অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় আছে মাত্র। এ সম্বন্ধে একটি কথা এ অঞ্চলেপ্রচলিত আছে। তাহা এ স্থলে বলা আবশ্যক।

জন লারমার যৌবনাবস্থায় এক পর্তুগীজ ইহুদী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিল, উক্ত স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাইবার পরে নিকটস্থ কুঠিয়াল এন্টুনি সাহেবের বিধবা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে ও এই বিবাহের ফলে তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রটি আকৃতিতে ও স্বভাবে পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠিল—শুনা যায় তাহার শিশু শরীর যেমন নবনীর মতো কোমল ছিল, তাহার মনটি ছিল তাহার অপেক্ষাও নরম ও স্নেহমায়াপূর্ণ। তাহার কোঁকড়া ২ সোনার মতো রং-এর চুল, তুলি দিয়া আঁকা দীর্ঘ ভুরু—নীচের আয়ত চোখ দুটিও সুন্দর—মুখখানি এখনো মনে করিতে পারে এমন প্রাচীন লোক এখনো এ অঞ্চলে আছে। তাহারা বলে দেবশিশুর মতোই সে সুন্দর ও মধুর প্রকৃতির ছিল।

একবার এক কুলিররমণীর প্রতি কি কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব তাহার খানসামা কার্তিককে বলে তাহাকে শ্যামচাঁদ পেটা করিতে। হতভাগিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। মার খাইতে খাইতে সে যখন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তখনো তাহার প্রতি চাবুকাঘাতের বিরাম ছিল না। ক্রমে সে যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় ধাত্রী লারমারের শিশুপুত্রটিকে লইয়া সাহেবের নিকট আনে—তখন ছেলেটি ৫/৬ বৎসরের। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া বালক অজ্ঞান হইয়া পড়ে—তৎক্ষণাৎ তাহাকে কুঠীতে বারান্দায় শুশ্রূষা ইত্যাদি করানো হয়—সে রাত্রেই তাহার ভয়ানক জ্বর বিকারে পরিণত হইয়া ছেলেটি মারা যায়। বিকারের ঘোরে ছেলেটি বারবার মারিও না, ও মরিয়া যাইবে, আর মারিও না বলিয়া বহুবার চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

লারমার সাহেব এই একমাত্র বৃদ্ধ বয়সের সন্তানটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিত। এই শোকাবহ ঘটনার পর সাহেব অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়ে, সাহেবের স্ত্রীও তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া জয়পুরের কুঠীতে তাহার ভ্রাতার নিকট বাস করিতে থাকেন এবং কয়েক মাস পরে সেখানেই মারা যান। ২/৩ বৎসরের মধ্যেই লারমার সায়েবকে কুঠী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়।

নদীর ধারে এই শিশুর সমাধি এখনো আছে। সমাধিটি বনগাছপালায় প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—ঝোপের মধ্য হইতে উপরকারের অগ্রভাগটা দেখা যায়। বৈঁচি ও শিঁয়াকুল কাঁটা ঠেলিয়া মধ্যে প্রবেশ করিলে কালো শ্লেট পাথরের নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি ইংরেজিতে দেখা যাইবে—

Here lies Edwin Lermer

the only son of John & Mrs Lermer

Born...&

এ সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এখানে উল্লিখিত হইল।

লারমার সাহেব কুঠী উঠাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবার প্রায় ২০ বৎসর পরে, কুঠীর বাড়ির ঘরদোর যখন পরিত্যক্ত ও জঙ্গলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই সময় একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের হর মজুমদারের পুত্র স্বরূপ মজুমদার মহাশয় নৌকাযোগে তাঁহার বৈবাহিক বাটী রামনগর হইতে স্বগ্রাম আগরতলায় ফিরিতেছিলেন। ইতিপূর্বে সন্ধ্যা হইলেও সুমুখ [?]জ্যোৎস্নারাত্রি থাকায় মাঠঘাট বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। কুঠীর নীচে দিয়া আসিতে আসিতে স্বরূপ মজুমদার মহাশয় লক্ষ্য করিলেন নদীর ধারে সমাধির কাছে কে যেন অত্যন্ত একমনে দাঁড়াইয়া কি লক্ষ্য করিতেছে ঐরূপ কিছু। নির্জন কুঠীর ধারে কে

এত রাত্রে কি করিতেছে দেখিবার জন্য স্বরূপ মজুমদারের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, মাঝিদিগকে তিনি নৌকা ভিড়াইতে বলিলেন। মাঝিরা প্রথমে তাঁহাকে বারণ করে, কারণ কুঠীর ত্রিসীমানায় লোকালয় ছিল না, তাহা ছাড়া কুঠীর মাঠে ভূতের ভয় করিয়া [?]জনপ্রবাদও ছিল [।] যাহা হউক, নৌকা ডাঙায় বাঁধা হইল। মজুমদার মহাশয় ডাঙায় উঠিয়া ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতার সহিত কুঠীতে অনেকবার গিয়াছিলেন—যদিও সম্মুখস্থ মূর্তি অনেকটা শীর্ণ, অনেকটা অবনমিত, অনেকটা অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল এবং মাথার চুলও যদিও সবই শুভ্র হইয়া পড়িয়াছে, তবুও মজুমদার মহাশয়ের সন্দেহ রহিল না যে ইহা অন্য কেহ নহে—স্বয়ং কুঠিয়াল জন লারমার। মজুমদার মহাশয় প্রথমত নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না কারণ ২০ বৎসরের উপর হইল লারমার কুঠী উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানিত না—সে দণ্ডায়মান মূর্তি হঠাৎ তাহাদের লক্ষ্য করিল। মজুমদার মহাশয়ের মনে হইল লারমার সাহেবের চোখ তিনি জ্যোৎস্নায় অশ্রুপূর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন—যাহা হউক তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই, সেই অতি বৃদ্ধ, অবনমিত,শীর্ণ ও বিষণ্ন মূর্তি ধীরে ধীরে কুঠীর মাঠের মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত ঘন বনের দিকে অগ্রসর হইল। মাঝিরা তাঁহাকে আর যাইতে বারণ করিল, সকলেই বলিল উহা লারমার সাহেবের প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই নহে—কিন্তু স্বরূপ মজুমদারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে তিনি যাহাকে দেখিয়াছেন সে জীবিত লারমার ছাড়া আর কেহই নহে। তবে কোথা হইতে কিরূপে এতকাল পরে সে প্রাচীন অবস্থায় পুনরায় তাঁহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার যৌবনকালীন লীলাক্ষেত্র দেখিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে স্বরূপ মজুমদার বা তাঁহার শ্রোতাদিগের কোনো ধারণা ছিল না।'

কুঠীর অন্য সমস্ত গাঁথুনির অপেক্ষা এই সমাধিটি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গেলেও এখনো অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় আছে।

আজ ২০ বৎসর ধরিয়া সকালসন্ধ্যায় কত বসন্তের নূতন বাতাস ভগ্ন, পরিত্যক্ত সমাধির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কত অস্তসূর্যের মৃদু আলো সমাধি প্রস্তরকে তাহাদের কিরণে অভিনন্দিত করিয়াছে, কত নূতন পুরাতন গাছ কত বৎসর ধরিয়া তাহার উপর পুষ্পদল বর্ষণ করিয়াছে। নির্জন মাঠের সঙ্গীহীন ঘুমন্ত শিশুটির প্রতি করুণায় তাহার স্নেহমমতায় এইরূপ নিঃশব্দে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দিয়া আসিতেছে—এখনো চৈত্র বৈশাখ মাসের সন্ধায় অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদালি গাছ থোলো থোলো হলুদ রঙের ফুলের ঝাড় দুলাইয়া সমাধির উপর স্নেহনম্র নয়নে দাঁড়াইয়া আছে।

'দশবারোখানা উলুখড়ে ছাওয়া দরমার বেড়া ঘেরা ঘর এই মাঠের মধ্যে একস্থানে অথচ একটু দূরে দূরে অবস্থিত। ইহাই জরীপের তাঁবু। সকালবেলা তাঁবুতে খুব ব্যস্ততার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মুহুরি, কারকুন, কানুনগো আমীনের দল ব্যস্তভাবে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে, তাঁবুর কোনো ঘরে আগুন লাগিলে ইহার অপেক্ষা অধিক ব্যস্ততা ইহারা দেখাইতে পারিত না। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজনেরা ২/১টি করিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে—জরীপের মুহুরি বা কারকুন অধিকাংশই পূর্ববঙ্গনিবাসী—তাহাদের খুব খাতির করিতেছে। জনৈক কর্মচারী গামছা পরিয়া নিজের ঘরের দাওয়ায় রান্না চড়াইয়া দিয়াছে, সে বকিতেছে,—বা রে রোজ রোজ আমি কাঠ কুড়িয়ে মরবো আর মজা করে সব নিয়ে যাবে—নিয়ে গেলেই হল, না ?পরে পার্শ্বের দরমা-ঘেরা ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—শরৎবাবু আর এরকম লন্ না যেন কোনোদিন—আমি মরি কুড়িয়ে আর—

দরমা-ঘেরা ঘরের আড়ালেও বোধ হয় অন্য কেহ রাঁধিতেছিল—উত্তর দিল—তোমার কাঠ কুড়িয়ে আমি লইতে গ্যালাম ক্যান্ ?আমার হাত নেই, আমি কুড়ুতে পারিনে ?যাও গিয়ে—ডিপ্‌টি সাহেবের কাছে নালিশ করেন গিয়া য্যান্—

একটি ঝগড়া সুবিধামত বাধিতে পারিল না, গোড়াতেই ভাঙিয়া গেল, কারণ এ সময়ে একটি প্রজা হাতে একটি লাউ ঝুলাইয়া রন্ধনরত অথচ দৃশ্যমান মুহুরিটির দাওয়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল—কহিল—স্যালাম আমীনবাবু, লাউ তো গছে হয়েল—তাই ভাবলাম যাই গিয়ে—

মুহুরিটি নিম্নস্বরে বলিল—চুপ চুপ এখুনি ডেপুটি সায়েব বেরুবেন—পরে সে ৪/৫ খানা ঘরের পরে কিছু দূরবর্তী একটা ঘরের দিকে সতর্কতার সহিত চাহিয়া দেখিয়া বলিল— দেখি লাউ আমার হাতে দ্যাও—পরে সে লাউটি হস্তে দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত মধ্যেই বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—এই যে মোড়ল, সকালে কি মনে করে ?বসো দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

কয়েকখানি ঘরের পরে একখানি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরে ভীতি ও আশঙ্কার আধার এই ডেপুটি সায়েব অর্থাৎ এই ডেপুটি সেটলমেন্ট অফিসার শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাহারপ্রাভাতিক ক্ষৌরকার্য সমাধা করিতেছিলেন। তাঁহার ঘরের এক কোণে একখানি ক্যাম্প খাট, তাঁহাতে একটি বিলাতী ফুলতলা চাদর পাতা বিছানা ও ঝালর দেওয়া মাথার বালিশ। অন্য কোণে একটি ক্যাম্প টেবিল ও দুখানি ক্যাম্প চেয়ার। টেবিলটিতে একটি ছোট ফটো-ক্যাবিনেটে একটি নববিবাহিত দম্পতির ফটো এবং পাত্রের ফটো দেখিয়া যতটা মনে হয়, ইহা খোদ শ্রীযুক্ত ডেপুটিসাহেবেরই ফটো ছাড়া দ্বিতীয় কাহারও নহে। ফোটো ছাড়া টেবিলের উপর একটি রিস্টওয়াচ, তাহাতে ৮টা বাজিয়া ১১ মিনিট হইয়াছে, খান পাঁচেক পুরাতন চিঠি, দুখান তুলার গদি-আঁটা সোনার জলে নামলেখা বাংলা উপন্যাস—৫/৬ দিনের পুরাতন একখানি 'Statesman' পত্রিকা (এখানি তাঁহার নবাগত বন্ধু এখানে আসিবার দিন গাড়িতে পড়িবার জন্য শেয়ালদহ স্টেশনে ক্রয় করিয়াছিলেন) ও দু তাড়া অফিসের লালফিতাবন্দী কাগজ-পত্র। ঘরের দেওয়ালের গায়ে ১৷৷০ টাকা মূল্যের র‍্যাকে একটি সোলার হ্যাট ও দুটি ছড়া, ও একটি খাঁকির হাফ-প্যান্ট ও কোট ঝুলিতেছে। তাহা ছাড়া ঘরের মধ্যে একটি বড় স্টীল ট্রাঙ্ক, দুটি চামটার সুটকেশ, একটি বেতের ঝাঁপি দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি নীরদবাবু ঘরের বাইরের দাওয়ায় মাটিতে বসিয়া সামনে আয়না রাখিয়া দাড়িতে সাবান মাখিয়া মুখ অত্যন্ত বিকৃত করিয়া ক্ষুর টানিতেছেন অপর দিকে তাঁহার নবাগত বন্ধুটি শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী স্টোভ জ্বালিবার দুরাশায় অনবরত স্পিরিট ঢালিতেছেন ও দিয়াশালাই জ্বালিতেছেন ও স্পিরিটটুকু জ্বলিয়া ফুরাইয়া গেলে পুনরায় স্পিরিট ঢালিতেছেন।

নীরদচন্দ্র কামাইতে ২ বন্ধুর কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন—এক বোতল যে প্রায় কাবার করে তুললে ?ওসব কবিত্বের কর্ম নয়—রেখে দাও, আমি কামিয়ে নি আগে।

নিজের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া বন্ধু অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া বসিলেন। নীরদবাবু দাড়ি কামানো সমাধা করিয়া স্টোভের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। বলিলেন—যতীশ, এক কাজ কর তোkindly বেতের বাস্কেটটার মধ্যে wrenchটা আছে, বার করে নিয়ে এস তো।

এমন সময়ে দেখা গেল তিনটি ছেলে তাঁবুর দিকে আসিতেছে—ইহারা অন্য কেউই নহে—সুনীল, অন্নদা রায়ের ছোট ছেলে ফণি ও অপূ। সেদিন অন্নদা রায়ের বাটী নিমন্ত্রণে যাইয়া ডেপুটিবাবু ও তাহার বন্ধু কথায় কথায় জানিতে পারেন যে এই গ্রামেই নরেন্দ্রনাথ রায়ের বাটী। ডেপুটিবাবুর বন্ধুটির পিতা কমলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী লাহোরে কমিশারিয়েটে বড় চাকরি করিতেন সেই উপলক্ষে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি ছিল। কাজেই যতীশবাবু এই সন্ধান পাইয়াই সুনীলদের বাটী খুঁজিয়া বাহির করিয়া সুনীলের মা (ইঁহাকে পূর্ব হইতেই যতীশবাবু খুড়িমা বলিয়া ডাকিতেন) ও সুনীলদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে খোদ শ্রীযুক্ত ডেপুটিবাবুর সহিতও উহাদের অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছে এবং সুনীল প্রভৃতি ছেলেদের সহিতও খুব আলাপ হইয়া গিয়াছে। একমাত্র অপূর সহিত ইঁহাদের পরিচয় একটু অন্যভাবে ঘটিয়াছিল, উহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

৫/৬ দিন পূর্বের কথা। সেদিন দুপুরবেলা হরিহর আহারাদি সারিয়া হাট করিতে বাহির হইলেও সর্বজয়া ম্যালেরিয়াক্লান্ত শরীরে একটুখানি আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, অপূ (বসিয়া পড়িতে আদিষ্ট হইলেও) ঘাঁটি আগলাইবার কেহ নাই দেখিয়া, ৬টি মাত্র কড়ি সঙ্গে করিয়া সে একেবারে একদৌড়ে গাঙ্গুলীপাড়ার জঙ্গল ও মজুমদারপাড়ার অধিকতর ঘন জঙ্গল ভাঙিয়া একেবারে জেলেপাড়ায় উপস্থিত হইল। কড়িখেলার উপর অপূর খুব ঝোঁক ছিল এবং তাহার বিশ্বাস ছিল যে তাহার হাতে টিপ এত বেশি যে কড়িখেলায় তাহার জিত অনিবার্য। নিজ পাড়ায়, গাঙ্গুলিপাড়ায় ও মজুমদারপাড়ায় সে অনেক খেলিয়াছে ও অনেক কড়ি জিতিয়াছে, এসব স্থানে জিতিবার মতো কড়িও আর বেশি নাই, বিশেষত উহার প্রতিভার উপযোগী প্রতিদ্বন্দ্বীই বা কোথায় ?দিগ্বিজয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষায়, বীরোচিত উচ্চাশায় মুগ্ধ হইয়া সে সেদিন বনজঙ্গল ছাড়াইয়া গ্রামের প্রান্তে যখন উপস্থিত হইল তখন ঝমঝম করিতেছে দুপুরবেলা [।] জেলেরা যাহার যাহার ঘরে আহারাদি সারিয়া সকলে শুইয়াছে, কেউ কেউ হাটে বাহির হইয়া গিয়াছে। অপূ জেলেপাড়ায় পূর্বে কখনো আসে নাই, কাহাকেও বড় চিনে না, তথাপি সে এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরিতে লাগিল। প্রথমে দুকড়ি জেলের ছেলেকে সমবয়সী দেখিতে পাইয়া বলিল—এই, কড়ি খেলবি ?ধীবরনন্দন কাছে আসিয়া বলিল—কটা কড়ি ?—অপূ নিজের পুঁজি দেখাইল—৬টি মাত্র। ধীবরপুত্র তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—"ছটা মোটে ?ওতে আর খেলবে কি ঠাকুর ?" অপূ জানিত সে হারিতে আসে নাই,জিতিতে আসিয়াছে সুতরাং বেশি আনিবার আবশ্যক কি ?কিন্তু তাহা বলা চলে না, জানাইল প্রয়োজন হইলে বাড়ি হইতে আনিবে। ধীবরপুত্র তাহাতে ভুলিল না, বলিল, খেলবো না। অপূ আরো ৩/৪ বাড়ি ঘুরিল, কেহ বলিল এত রদ্দুরে আবার খেলা কি ?কেহ বলিল এখনি বাবার সহিত নৌকা বাহিতে বাহির হইতে হইবে, কোনো কোনো অভিভাবক ধমক

দিয়া কহিল—যাও যাও ঠাকুর, বাড়ি যাও, ঠিক দুপুর রোদে এসেচে কড়ি খেলতে ?বামুনপাড়ার ছোঁড়াগুলো আমাদের গাঁয়ে সব আমাদেরই— ?

অনেক স্থানে ঘুরিয়া ও বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে বুধ পাড়ুইয়ের ছেলে পঞ্চা খেলিতে স্বীকার করিল। অপূ দু এক দান খেলিল ও জিতিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে সে ক্রমাগত জিতিতে লাগিল। পঞ্চা একবার হারিয়া গিয়া আরো কতকগুলি কড়ি বাহির করিয়া আনিল ও ক্রমে ক্রমে সেগুলি হারিল। ক্রমে আরো অনেক খেলুড়ে আসিয়া জুটিল, অপূর কাছে সকলে হারিতেই লাগিল। ৬টি কড়ি হইতে অপূর প্রায় এক পণের কাছাকাছি কড়ি হইয়া দাঁড়াইল। এত কড়ি অপূ পূর্বেও কখনো জিতে নাই, একত্রও কোনোদিন দেখে নাই, সে অত্যন্ত আহ্লাদে সেগুলি কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া হাত দিয়া অনুভব করিতেছে, এমন সময় জেলেপাড়ার ছেলেগুলি (প্রায় সকলেই অপূ অপেক্ষা বয়সে বড়) কি পরামর্শ করিল। একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—এই ঠাকুর, কড়ি নিয়ে কোথায় যাবি ?বের কর্ কড়ি।

এত কড়ি ইতিপূর্বে কোনোদিন সে জিতে নাই, তখন সে কড়িগুলি মহা আহ্লাদে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতেছে, অবাক হইয়া বলিল—বারে—আমি জিতলাম, বার করবো কেন ?

আরো দুইজন আলকাতরা-মার্কা ছেলে আগাইয়া আসিল—আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল যা কড়ি এখানে রেখে যাও—

অপূ বলিল—কেন রাখবো, বেশ তো, আমি যে জিতলাম। তোমরা যদি জিততে আমি চাইতাম নাকি ?তোমরা এখনো খেলো না, আমি তো জিতে পালাচ্ছি নে, কড়ি আনো না, আমি বলচি তো এখনো খেলবো।

তখন ৫/৬ টি ষণ্ডামার্কা ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন বলল—ঘুঘু দেখেচো, ফাঁদ দেখোনি ঠাকুর, সব কটি এখানে রেখে তবে বাড়ি যাও, নয়তো এক বাঁশের চটায় একেবারে ঠ্যাং খোঁড়া করে ছেড়ে দেবো, জানো না ?এখান থেকে কড়ি নিয়ে তুমি পালাবে ?

অপূর বাপের অবস্থা যদি ভালো হইত, ছেলেদের সাহস হইত না তাহারা ব্রাহ্মণপাড়ার কোনো ছেলেকে এরূপ করিয়া বলে, কিন্তু কে না জানে যে অপূর বাবা হরিহর গরিব ও তাহার উপর খোঁড়া। তাহার ছেলেকে মারিলে কি হইবে ?কিছুই না। হরি খোঁড়ার ক্ষমতা কি কিছু করিবার ?অপূ এ মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিল না, সে বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া শেষ উপায় অবলম্বন করিল। বলিল—নাও না কড়ি কেড়ে ?এখখুনি বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলে দেবো না ?দেখবে এমন মজা।—

সকলে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল—হঃ, হরি খোঁড়া সব করবে আমাদের, মারের ভয়ে যাবো কোথায়, পিঁপ্ড়ের গর্তে লুকোবো নাকি ?—দু একজন কথায় কার্যে সামঞ্জস্য দেখাইবার নিমিত্ত উক্ত প্রাণীর আবাসস্থান সন্ধানে ইতস্তত ধাবিত হইবার অভিনয় করিল। কিন্তু এখানে সকলেই সুকুমার শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট নহে, এই শ্রেণীর একটি ছেলে আসিয়া অপূর মুখে [?] করিয়া এমন এক চড় কষাইল যে, সে একেবারে দুই তিন হাত জমি ঘুরিয়া গিয়া পড়িল—কিন্তু তখনো সে প্রাণসমপ্রিয় পুঁটুলি ছাড়ে নাই, ভয়বিহ্বলভাবে প্রাণপণে দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে। আর একজন আসিয়া তাহাকে আর একটি চড় কষাইয়া তাহাকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া ফেলিল ও তাহার হাত সজোরে ছাড়াইয়া দিয়া কড়ির পুঁটুলী ধরিয়া টান মারিল—কড়িগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া গেল—বাকী সকলে টপাটপ সেগুলি কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। ঠিক সেই সময়ে ডেপুটি সেটলমেন্ট অফিসারের বন্ধু যতীশবাবু এক আর্দালীর সঙ্গে পাশের পথে উপস্থিত হইলেন—ইনিগ্রামের জঙ্গলে শজারু পাওয়া যায় শুনিয়া বন্দুক হাতে উক্ত প্রাণী শিকার করিবার দুরাশায় উৎফুল্ল হইয়া দুপুরে রৌদ্রেই অপূর মতোই বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন চারটি বড় ছোট আমবাগান, বাঁশবাগান খুঁজিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন একটি ছোট ছেলেকে ৫/৬টি ছেলেতে মিলিয়া খুব মারিতেছে।

ইঁহারা নিকটে আসিয়া পড়িতেই জেলেপাড়ার দল যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া অদৃশ্য হইল। ভীতিব্যাকুল চোখের দিশাহারা দৃষ্টি দেখিয়া যতীশবাবু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে হাত

ধরিয়া উঠাইলেন—দেখিলেন ৫/৬ বৎসরের ছোট ছেলে, দুই রগে ফর্সা রঙের উপর পাঁচটা আঙুলের দাগ রক্তে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—বড় বড় চোখ দুটিতে ভীতিব্যাকুল দিশাহারা ভাব। এই (সুন্দর) সুকুমার নিষ্পেষিত অসহায় শিশুটি যে এ পাড়ার নহে তাহা ইঁহাদের বলিতে হইল না—মার খাইয়া অপূ দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছিল। এরকম মার সে কখনো খায় নাই, চড়ের চোটে তাহার মাথা তখনো ঝনঝন করিতেছে।

যতীশবাবু সস্নেহে তাহার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে অপূর হঠাৎ বড় কান্না আসিল। কিন্তু তাহা সে চাপিয়া রাখিল, কাঁদিল না—যতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কড়িগুলো তোমার না খোকা ?—আচ্ছা দাঁড়াও, কুড়িয়ে দিচ্ছি—ভূপতিত

কড়িগুলি কুড়াইয়া তাহার কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—চল খোকা, তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি—এরকম জায়গায় একলা আসতে আছে কখনো ?আর কখনো এসো না—

পরে হাত ধরিয়া তিনি অপূকে তাহাদের বাড়ির দোর পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ছেলের দল কাছে আসিলে যতীশবাবু অপূর দিকে চাহিয়া বলিলেন—এস এস খোকা,—কি, তুমি আর কি কড়ি খেলতে যাও ?

অপূ স্বভাবত লাজুক, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

নীরদবাবু বলিলেন—এ খোকাটি বেশ দেখতে, মুখখানা ভারি সুন্দর—তোমাদের বাড়ি কোথায় থোকা ?

অপূর গায়ের রং ও বড় বড় সুশ্রী চোখ দুটি ও মুখের সুকুমার লাবণ্য তাহার মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিল, কারণ সর্বজয়া অতি গরিবের ঘরের মেয়ে হইলেও এক সময় সে দেখিতে ভালোই ছিল। এখন অবশ্য রোগে, অযত্নে, দারিদ্র্যে, সংসারের খাটুনিতে শ্রীর কিছুই নাই—তবু এক সময়ে সে যে সুন্দরী ছিল, ইহা তাহার বর্তমান চেহারা দেখিয়া অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সুনীল উত্তর দিল—এ আমার ভাই হয়, আমার কাকাবাবুর ছেলে, এক বাড়িতেই বাড়ি।

যতীশবাবু অবাক হইয়া গেলেন—বল কি হে ?তা তো জানিনে— হ্যাঁ হ্যাঁ, সেদিন একে সঙ্গে করে তোমাদের বাড়ির কাছেই রেখে এসেছিলাম বটে, তা ঐ এক বাড়িই যে বাড়ি তা কি করে জানবো ?খোকাও তো আমায় কিছু বলেনি সেদিন—না খোকা ?

তাহার পর ছেলেরা চা খাইতে অনুরুদ্ধ হইল। নীরদবাবু স্টোভে কিছু হালুয়া তৈয়ারি করিয়া ফেলিলেন। ঘরের মধ্যে বেতের ঝাঁপিটার মধ্যে পেঁপে ও শাঁক-আলু ছিল (প্রজাদিগের দেওয়া), যতীশবাবু একখানি চা-বাগানের ছুরির সাহায্যে সেগুলির খোসা ছাড়াইয়া টুকরো টুকরো করিয়া কাটিলেন—ছেলেদের সকলকে দেওয়া হইল। ফণি চা খাইতে চাহিল না, সে কখনো খায় নাই—তাহার মুখে ভালো লাগে না, সে শুধু পেঁপে, শাঁক-আলু ও হালুয়া খাইল।

সুনীল ঘরের মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য কৌতূহলবশত ঘরের মধ্যে ঢুকিল—অপূ তাহার পিছনে পিছনে গেল—ফুলতলা বিলাতী [চাদর ?] বিছানার উপর দেখিয়া অপূর যা আনন্দ। এরকম আসবাবপত্র সে কখনো দেখে নাই—যতীশবাবুর উপর একে তো সেই কড়িখেলায় জিতিবার দিন হইতেই তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল—অদ্য তাহার উপর যতীশবাবুর হাতে রিস্টওয়াচ দেখিয়া পূর্বের আকর্ষণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হইল। কেমন সুন্দর সাহেবদের মাথারটুপীটা। ওটা কি পরে ?—আচ্ছা গাছটা শাদা কেন ?হাড়ের বোধ হয়। না ?—কাঠের ?—সে হাত দিয়া টিপিয়া দেখিলে—তাই তো ! ভারি মজার তো—দূর হইতে যে হাড় বলিয়া মনে হয়। ওখানা কি ?কেমন সুন্দর ছবিখানা।—পাঁজি ?তো দেয়ালের গায়ে টাঙানো কেন ?তাহাদের পাঁজি তো বাবার বাক্সের মধ্যে থাকে—জুতা জোড়া কেমন চকচকে দেখিতে। সে কখনো ঐ রকম জুতা পরে নাই—অনেকদিন হইল বাবা একবার ঘুন্টি দেওয়া বোতামওয়ালা জুতা নবাবগঞ্জ হইতে তাহার জন্য আনিয়াছিল—সে তখন আরো ছোট ছিল—তাহার মধ্যে রাঙা রং মাখানো, এদিক ওদিক বেড়াইয়া সে যেমন জুতা খুলিয়া রাখিত—তাহার মনে আছে, তাহার পা দুখানা জুতার রং-এ রাঙা হইয়া যাইত—তাহার মা খেপাইত—খোকন আমার আলতা পরেচে, দ্যাখো ও মেজখুড়ি, খোকনের পায়ে কেমন আলতা। একথা তাহার মনে আছে। বাঃ ঐ বইখানা কিসের বই ?এমন সুন্দর, এত বড় বই সে তো কখনো দেখে নাই—তাহাদের বাড়ি একখানাও বই নাই—সুনীলদার যে বই আছে, তাহাও এত বড় নয়—

অপূ জিজ্ঞাসা করিল—ওখানা কি বই সুনু দাদা ?

যতীশবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া wrench যন্ত্রটি যথাস্থানে রাখিতেছিলেন—বলিলেন, এস খোকা, তোমাকে বইয়ের ছবি দেখাই। বইখানি তাঁহারই সম্পত্তি।

তিনি একটি বেতের চেয়ারে বসিলেন, অপূকে কাছে বসাইলেন—সুনীল ও ফণি তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বইখানি Sir Oliver Lodge-এর Pioneers of Science. তিনি ছবিগুলি একে একে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—ইহা পৃথিবীর ম্যাপ, ইহা টেলিস্কোপ, টেলিস্কোপ কি জিনিস—ইহা বড় টেলিস্কোপের সাহায্যে লওয়া চন্দ্রমণ্ডলের ফটোগ্রাফ—চাঁদের মধ্যের পাহাড় পর্বত (অপূর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত), নক্ষত্রগুলি কি জিনিস—ধূমকেতু কাহাকে বলে—নিউটন কে

ছিলেন—সূর্য কত বড়, পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, নক্ষত্রগুলি কত দূরে আছে, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া বকিতে লাগিলেন।

নীরদবাবু বলিলেন—রাখো হে রাখো, ওসব চাপা দিয়ে রেখে দাও, বেলা দশটা বাজে, ওরা এল একটু বেড়াতে, তুমি ওদের নিয়ে বকুনি শুরু করে দিলে। বন্ধুর আপত্তি সত্ত্বেও আর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যতীশবাবু বকুনি থামাইলেন। ছেলেরা বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে দুই বন্ধুকে পুনরায় তাহাদিগকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। অপূকে আদর করিয়া বলিলেন—তুমি আবার এস খোকা। ঠিক ঠিক আসবে তো ?

অপূর এবার লজ্জা ভাঙ্গিল—সে বলিল—আপনিও আমাদের বাড়ি আসবেন—কবে আসবেন বলুন।

যতীশবাবু বলিলেন—নেমন্তন্ন না কর্লে যাবো কেন খোকা ?

অপূ বলিল—আমি মাকে গিয়ে বলবো, আপনাকে নেমন্তন্ন কর্তে।

সকলে হাসিয়া উঠিল—অপূ একটু অপ্রতিভ হইল। তাহার কথায় হাসিবার এমন কি কারণ আছে ?

তাহার পর ছেলের দল বাড়ি চলিল। অপূ অবাক হইয়া গিয়াছিল।

লাউকুমড়ার মাচার ফাঁকে, শেওড়া রাংচিতা বনের গণ্ডী পার হইয়া মায়ের হাতের রান্না কচুর শাক ও বড়িভাজা ছাড়াইয়াও কোন্ দূরের জগৎ আবছাওয়া আবছাওয়া ভাবে তাহার শিশুদৃষ্টি আজ নূতন যেন দেখিতে পাইয়াছে। তাহার শিশুমন যেন নূতন ধরিতে পারিয়াছে...

আচ্ছা, ও কথাগুলি সব সত্যি তো ?সত্যি নিশ্চয়, সে যে ছবি দেখিল। উহা ছাড়া যতীশবাবু যে বলিলেন—

চাঁদের মধ্যে পাহাড় পর্বত ?আচ্ছা পাহাড়-পর্বত কি ?উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি তো ?যেমন ঐ পালিতপাড়ার জঙ্গলের মধ্যে আছে ?ঐরকম সব চাঁদের মধ্যেও আছে ?আশ্চর্য কাণ্ড !

বাড়ি গিয়াই মাকে সে এসব কথা এক্ষুনি বলিবে।

(এখানে পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত। পত্রাঙ্ক না থাকায় কত পাতা লুপ্ত তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। পরবর্তী অংশ এইপ্রকার)

'কাপড় কঞ্চিতে আটকাইয়া গিয়াছিল—ছাড়াইয়া দিয়া সে রায়পাড়ার ছেলেদের দিকে ফিরিয়া বলিল—খুব তো সব ?এক্ষুনি ছেলেমানুষ যে গিয়েছিল। নিজেকে যদি এরকম কেউ কর্ত, তাহলে কিরকম হয় ?'

পচা সুনীলের অপেক্ষা বড়—সে আগাইয়া আসিয়া বলিল—ওঃ ভারি যে চোখরাঙ্গানি। পশ্চিমে খোট্টা কোথাকার, তোমায় আমরা ভয় করি নাকি। মেলা চালাকি করো না বলে দিচ্চি—

সুনীল বলিল—আচ্ছা ভয় না কর, কি করবে আমায় করো। এই দাঁড়ালুম—এসো দিকি।

সুনীল চিৎকারও করিল না—মারিতেও গেল না—বা পিছাইয়া আসিল না, পরে অপূকে বলিল—অপূ তুই আমার পেছনে এসে দাঁড়া। যুদ্ধটা ভালোরকম করিয়াই বাধিত, এমন সময় নেড়ার পিসি নেত্য ঠাকরুণকে আসিতে দেখিয়া দলের ছেলেপিলেরা অন্তত নেড়া— একটুখানি তটস্থ হইল। নেত্য ঠাকরুণ নিকট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রে সব ! চেঁচামেচি কিসের শুনি ?নেড়া বলিল—পিসিমা, অই রায়বাড়ির ছোঁড়া দুটো আমাদের মারতে এসেচে। নেত্য ঠাকরুণ চোখে ভালো দেখিতেন না। আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, রায়বাড়ির ?কাদের ছোঁড়ারে ?ফণি বলিল—ঐ হরি খোঁড়ার ছেলে অপূ। তাদের বাড়ি এই পশ্চিম থেকে—ফণির কথার শেষ দিকটায় সকলে মিলিয়া একসঙ্গে নামতা পড়ার সুরে বলিল—একটা খোট্টা এসেচে। নেত্য ঠাকরুণ মুখ বিকৃত [করিয়া ?] তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'এঃ বলে চালে নেই খড়, চুলোয় নেই ছাই ধনি এসেচেন আবার কাপড় কসাই [?]করে ঝগড়া কর্তে, বাপের তো মুরোদ কত, তার ছেলে আবার আত্মারাম সদ্দার...ফের যদি এ পাড়া মাড়াবি, ঠ্যাং একেবারে খোঁড়া করে ছাড়বো—আরে রে—চল্, এই আয় নেড়া, ফণি, এস আর ঝগড়া কর্তে হবে না, এস বাড়ি এস।

নেত্য ঠাকরুণ সদলবলে পিছনে ফিরিলে সে অপূর দিকে ফিরিল—পিতার অপমানসূচক উল্লেখে অপূর চোখে জল আসিয়াছিল—সুনীল তাহার কাঁধে হাত দিয়া নেত্য ঠাকরুণের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'নেড়ার দিদিমা'। সুনীল বলিল—আয় অপূ চল বাড়ি যাই, কাঁদিস নে—

অপূ চলিতে চলিতে ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না—নেড়ার পিসিমা কেন তাহাকে এমন করিয়া বকিল ! সে কি করিয়াছে ?সে [তো ?] বাঁশ ডিঙাইতে যাইতেছিল। আর ওরাই বা বাবাকেকেন ওরকম করে বল্লে ?বাবাকে বলে খোঁড়া, খোঁড়া বল্লেই হল— কোথায় তার বাবা খোঁড়া ?—নেড়াটা কি মিথ্যুক।

(নিচের অংশটি উপন্যাসের শেষ দিকের কাহিনীর খসড়া কোনো কারণে লেখক এখানেই লিখে রেখেছেন।)

'ভাদ্রমাসের শেষ। এতদিন তাহাদের ইছামতীতে ঢল নামিয়াছে, হয়তো তাহাদের ঘাটের পথে শিমুলতলাটায় জল উঠিয়াছে। ঝোপেঝাড়ে ওড়কলমীর ফুল ফুটিয়াছে, শ্যামল বনান্তস্থলী, নাটাফুলের, নীল বনকলমী ফুলের সম্মিলিত সুবাসে ভরিয়া গিয়াছে, সেই লেজঝোলা হলদে পাখিটা হয়তো ডালে দুলিতেছে।

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর দিনে রাতে, সন্ধ্যা সকালে সব সময় তাহাকে ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠটা ডাক দেয়, কদমতলার পারের পথটা ডাক দেয়। সে যতক্ষণ না ফিরিয়া যাইবে, ততক্ষণ ডাক তাহাদের একটানা চলিবে।

পরে ঘুম পাওয়ায় জানলা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

অনেক বলাবলির পর সে তাহার মাকে রাজী করাইল। নিশ্চিন্দিপুরেই ফেরা ঠিক। গিন্নিমা টাকা দিলেন, মেজ বৌরানীও টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

অনেক বেলায় মাঝেরপাড়া স্টেশনে তাহারা নামিল। সে একখানা গোরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া মাকে জিনিসপত্র সমেত গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া—নিজে গাড়ির পাশে পাশে হাঁটিতে লাগিল। বেত্রবতী নদীর ছোট খেয়া পার হইয়া তাহারা আষাঢুর বাজারে পৌঁছিল। সেক্‌রা দোকানে সেইরকম ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ হইতেছে, আজও হাটবার, অনেক গোরুর গাড়ি ওপারে জড় হইয়াছে। নতিডাঙার বাঁওড়ের উপর সেই কাঠের পুলটা, নীচে সেইরকম কচুরীপানার বেগুনী রং-এর ফুলের শীষ্‌ মন্দ মন্দ স্রোতে দুলিতেছে।

মাঝেরহাট গ্রামের বাজারের বারোয়ারিতলায় বড় শামিয়ানা টাঙাইয়াছে, অনেক দোকানপসার বসিতেছে, বারোয়ারি বসিবে। সে মাকে বলিল, সে এখানে যাত্রা শুনিতে আসিবে।

দূর [?]সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটা চোখে পড়িতেই তাহার বুকের ভিতর হইতে কি একটা ডেলা উঠিয়া গলায় আটকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি'—

[পথের পাঁচালীর অপরিচিত পাণ্ডুলিপির এইখানেই শেষ।]

সমগ্র অংশের টিকা : তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়